একক ১১৩ ❑ বাংলা বানানের সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস

গঠন

১১৩.১ উদ্দেশ্য

১১৩.২ প্রস্তাবনা

১১৩.৩ মূলপাঠ ১ ঃ বানান-ভাবনার ইতিবৃত্ত

১১৩.৩.১ সারাংশ-১

১১৩.৩.২ অনুশীলনী-২

১১৩.৪ মূলপাঠ-২ ঃ বানান সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯২৫ থেকে ১৯৭৯)

১১৩.৪.১ সারাংশ-২

১১৩.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৩.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ বানান সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯৮২ থেকে ২০০১)

১১৩.৫.১ সারাংশ-৩

১১৩.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১৩.৬ সহায়ক পাঠ

১১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির লক্ষ্য, বাংলা বানানের মূল সমস্যা নিয়ে গত ১২৫ বছর ধরে বাংলার বানান-ভাবুকেরা কী ধরনের ভাবনা-চিন্তা করে আসছেন, এবং সেসব সমস্যার সমাধানের কী কী উপায় তাঁরা সুপারিশ করছেন, সেসব তথ্য সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা। আরও লক্ষ্য—আপনি নিজেও বানান-সমস্যার বিষয়ে গুরত্ব দিয়ে ভাবতে শিখুন, সমস্যাটা কমিয়ে আনতে আপনিও আপনার লেখায় **সঠিক** বানান প্রয়োগ করতে থাকুন।

১১৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা বানান-ভাবনারও একটা ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান-সন্ধানের ভাবনা। এসব ভাবনা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক জমে উঠেছিল অন্ততপক্ষে দুবার—একবার বিশ-তিরিশের দশকে, আর-একবার আশি-নব্বই-এর দশকে। প্রথম দফার বানান-ভাবনা থেকে গড়ে উঠেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি, ১৯৩৬-৩৭ সালে বেরিয়েছিল 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে বাইশ রকমের নিয়ম বেঁধে-দেওয়া একটি পুস্তিকা। দ্বিতীয় দফার বানান-বিতর্কের চূড়ান্ত পরিণাম ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে 'আকাদেমি বানান অভিধান' আর 'বানানবিধি'-র প্রকাশ। বলা বাহুল্য, 'বাংলা বানানের নিয়ম' আর 'বানানবিধি' বানান-সমস্যার জটকে খানিকটা আলগা করেছে, পুরোপুরি খুলে দিতে পারে নি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সমস্যা নতুন নতুন চেহারা নেবে, সময়ের উপযোগী সমাধান খুঁজে নেবার প্রক্রিয়াও চলতেই থাকবে। এর বিরাম নেই, অবসান নেই। বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের এই বিরামহীন ভাবনা আর আন্দোলনই চলতি এককের বিষয়।

১১৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ বানান-ভাবনার ইতিবৃত্ত

একক-১ থেকে জানলেন বাংলা লেখায় বানান-প্রয়োগের একটা মোটামুটি ইতিহাস। এ-ও জানলেন, বানান-প্রয়োগের ইতিহাসটি প্রায় হাজার বছরের। এবার আমরা ভাবতে চাই বানান নিয়ে আর-একটি ইতিহাসের কথা। সে ইতিহাস বানান-ভাবনার। বাংলা শব্দের কোন্ বানান সঠিক অথবা কোন্‌টি সঠিক নয়, একই শব্দকে নানারকম বানানের হাতছানি থেকে বাঁচিয়ে কীভাবে বানানে সমতা আনা সম্ভব, বানান-লেখার সমস্যাগুলি কী ধরনের আর এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে কোন্ পথে—এসব নিয়ে নানাজনের নানারকম বিচার বিশ্লেষণ বিতর্কের যে ধারাটি বানান-প্রয়োগের পাশাপাশি বয়ে চলেছে, তারও একটা ইতিবৃত্ত ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠছে। এ ইতিহাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে প্রায় ২৫ বছর আগে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে Bengali Spoken and Written নামের এক দীর্ঘ প্রবন্ধে চলিত বাংলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষ করলেন—বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর নেই, ঞ-ণ-য-ষ নেই, ম-ফলা য-ফলা নেই, বিসর্গ নেই, অথচ বানানে এ বর্ণগুলির প্রয়োগ দিব্যি চলছে।

তখন থেকেই বানানে এসব বর্ণের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠল, অন্ততপক্ষে অ-তৎসম শব্দে এসব বর্ণ বাদ দিয়ে উচ্চারণ মেনে বর্ণ-প্রয়োগের কথাও উঠল। বাংলা বানান নিয়ে ভাবনা-চিন্তার শুরু এখান থেকেই। এর পর এলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' বইখানা শুরু হল 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধটি দিয়ে, ১৯০৪-এ তা সম্পূর্ণ হল 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে। আর ১৯৩৮-৩৯-এ বেরোল তাঁর 'বাংলাভাষার পরিচয়' বইটি। ১৮৮৫ থেকে ১৯৩৯—এই ৫৪টি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের নানারকম সারস্বত ভাবনার অন্যতম হয়ে উঠেছিল বানান-ভাবনা।

বানান-ভাবনার ১২৫ বছরের ইতিহাসে স্মরণীয় দুটি বছর ১৯৩৭ আর ১৯৯৭। ১৯৩৭-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় এবং সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশ করে। আর ১৯৯৭-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বের হয় 'আকাদেমি বানান অভিধান' আর 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি'। অর্থাৎ, ১৮৭৭ থেকে যে ভাবনার শুরু তার একটি পরিণাম ১৯৩৭-এ। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রয়োগ-প্রচলন নিয়ে নতুন করে যেসব বিতর্ক দেখা দিল, তার পরিণাম ১৯৯৭-এ। ১৮৭৭ থেকে ১৯৩৬—'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা প্রকাশের আগেকার এইপর্বে বানান নিয়ে যা-কিছু ভাবনা, তার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব, সেই ভাবনার চেহারাটাই প্রথমে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা যাক।

বাংলা উচ্চারণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ১৮৮৫-তে লেখা 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধ থেকেই শুরু হল এইভাবে—'বাংলায়.....কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙিন ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—গবর্ণমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।' তবে বাংলা বানান নিয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভাবনা শুরু হয় ১৯০০ সালে লেখা 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধে, 'নিশ্বাস' শব্দে বিসর্গের থাকা বা না-থাকা নিয়ে তাঁর মন্তব্য থেকে—'স যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে; যথা নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, প্রাতস্নান।' প্রায় একই সময়ে লেখা আর-একটি প্রবন্ধে (বিবিধ/শব্দতত্ত্ব) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা, ভাঙা, ডাঙা, আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ্গ অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে একথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদকে চান্দ, পাঁক-কে পঙ্ক, কুমার-কে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনা-কে সোণা, কান-কে কাণ বানান করেন, অথচ

শ্রবণশব্দজ শোনা-কে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই।'

দেখা গেল, বাংলা বানানে ঙ্গ-ঙ ণ-ন আর জ-য বর্ণের প্রয়োগে বানান-লেখকদের অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন বিশ শতক শুরু হতে-না-হতেই, এবং তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন সরাসরি। এসব প্রশ্ন আর দ্বিধার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই ১৯৩৫ সালে গঠন হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির, ১৯৩৬-এ-বেরিয়ে এল বাংলা বানানের ২২-দফা নিয়ম। এর আগে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুধীর মিত্র, জ্যোতির্ময় ঘোষ থেকে শুরু করে ক্রমশ বানান-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং পরে ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো বিদগ্ধ জন।

এইরকম বিশিষ্ট পণ্ডিতজনের বিতর্কে বাংলা বানান নিয়ে বাঙালির ভাবনা যথেষ্ট উচ্চতা পেয়েছিল। এরই রেশ টেনে চল্লিশ থেকে আশির দশকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি বই-ও লেখা হয়ে গেল বাংলা বানান নিয়ে। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ নিজেই লিখলেন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান' (১৯৪০), মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখলেন 'বাংলা বানান' (১৯৭৮), বের হল অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙলা বানানবিধি' (১৯৮২) আর অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৮৭)। ১৯৩৬-৩৭ এর 'বাংলা বানানের নিয়ম' নতুন করে বিতর্কের ঢেউ তুলল, এবং ঢেউয়ে ঢেউয়ে বানান-ভাবনা ভেসে এল আশি-নব্বই-এর দশক পর্যন্ত। এর মাঝখানে ষাটের দশকে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেবার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর-একটি বানান-সমিতি গঠন করল, তবে তা বিশেষ কোনও কাজে লাগেনি। অবশেষে ১৯৮৫-তে বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে চলল আরও উত্তেজক আরও প্রসারিত তর্ক-বিতর্ক, দুই বাংলার বানান-ভাবুকদের অভিজ্ঞতা আর অভিমতের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত একটা কালানুগ পরিণাম পেল সেসব বিতর্ক। ১৯৯৭ সালে বেরিয়ে এল আকাদেমি গৃহীত ২০-দফা বানানবিধি, সেইসঙ্গে প্রায় ১৫,০০০ শব্দের একখানি বানান অভিধান। ক্রমশ সর্বশেষ বানান-বিবেচনার কিছু কিছু চিহ্ন নিয়ে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে বের হল তার তৃতীয় সংস্করণ। এবার এর শব্দ-সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় তিনগুণ (৪৩,০০০-এর মতো)।

এমনি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দবাজার পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মতো

প্রতিষ্ঠান আর শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আজকের বানান-ভাবুকেরা পর্যন্ত বাংলা বানানে সমতা 'আর সরলতা বিধানের উপায় সন্ধান করার পথে যেভাবে ভেবে চলেছেন, তারও একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল এরই মধ্যে, সে ইতিহাস প্রায় ১২৫ বছরের (১৮৭৭ থেকে ২০০১)।

১১৩.৩.১ সারাংশ—১

বাংলা বানানের সমস্যা, তার সমাধানের উপায়, বানানে সমতা আনার পদ্ধতি—এসব নিয়ে বানান-ভাবনার একটি ইতিহাস তৈরি হয়ে উঠছে প্রায় ১২৫ বছর ধরে। এ ইতিহাসের এক প্রান্তে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্য প্রান্তে একালের বানান-ভাবুকেরা। ১৮৭৭ সালে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতি নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তুললেন। ১৮৮৫ সালের 'বাংলা উচ্চারণ' আর ১৯০০ সালের 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও উত্থাপন করলেন এই ধরনের আরও কিছু অসংগতির কথা। ক্রমশ বানান নিয়ে এসব ভাবনায় অংশ নিতে থাকলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সুধীর মিত্র-জ্যোতির্ময় ঘোষ-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রমথ চৌধুরী-বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-মুহম্মদ-শহিদুল্লাহ-দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত। ১৯৩৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির তত্ত্বাবধানে বাংলা বানানের ২২-দফা নিয়ম বেরোনোর আগে আর পরে বানান নিয়ে নানারকম বিতর্কের অংশীদার এই ভাবুকেরা।

চল্লিশ থেকে আশির দশকে বের হল অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান', মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান', অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙলা বানানবিধি' আর অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'বাংলা বানান সংস্কার, সমস্যা ও সম্ভাবনা'—বানান-ভাবনা নিয়ে এই ধরনের কয়েকখানি বই। ১৯৮৫-তে বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা, শুরু হল দুই বাংলার বানান-ভাবুকদের নানারকম বিতর্ক-বিবেচনা। ১৯৯৭ সালে বের হল 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি' আর 'আকাদেমি বানান অভিধান।' ২০০১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশ পেল এর তৃতীয় সংস্করণ—বাংলা বানান-বিবেচনার সর্বশেষ চিহ্ন নিয়ে। এমনি করে তৈরি হতে চলেছে বাংলা বানান-ভাবনার ১২৫ বছরের ইতিহাস।

১১৩.৩.২ অনুশীলনী—১

১. বাংলা বানান নিয়ে শতাধিক বছরের ভাবনা-চিন্তার ইতিহাসটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২. বাংলা বানান নিয়ে কীভাবে ভাবনা শুরু হয়েছিল, লিখুন।

৩. বাংলা বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার রূপরেখাটি তৈরি করুন।

৪. ১৯৩৫ থেকে ১৯৮৫—এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা বানান নিয়ে বাঙালির ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে, সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১১৩.৪ মূলপাঠ—২ ঃ বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯২৫ থেকে ১৯৭৯)

গত শতকের বিশের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক, অথবা আরও নির্দিষ্ট করে ১৯২৫ থেকে ১৯৭৯—পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র নিয়ে যেসব ভাবনা-চিন্তা হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু অংশ বাছাই করে চলতি এককের এই মূলপাঠে তুলে ধরা যাক।

১. ১৪ এপ্রিল ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা 'বাংলা বানান সমস্যা' প্রবন্ধে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন—'বাংলা বানান সমস্যা আজিকার সমস্যা নয়। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কবি রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, স্বর্গীয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চলন্তিকা-কার রাজশেখর বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ কেহ প্রত্যক্ষ এবং কেহ বা পরোক্ষভাবে বাঙ্গালার এই গুরুতর সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বৎসর দশেক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ মহাশয় কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে একটি খসড়া বানান পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।'

বিজনবাবুর দেওয়া তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায়, বাংলা বানানের বেশ কিছু জটিল সমস্যা তখনও ছিল, তার আগেও ছিল, এবং তার সমাধানের চেষ্টাও অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিজনবাবুর এই লেখার 'বছর দশেক পূর্ব্বে' অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯২৫-এর (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 'প্রবাসী' পত্রিকায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রকাশ করেছিলেন 'চলতি ভাষার বানান' নামে ১১-দফা বিধান নিয়ে তৈরি একটি খসড়া বানানপদ্ধতি। বানান-সমস্যা সমাধানের জন্য এটাই প্রথম সক্রিয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগে সামিল ছিলেন সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় আর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ পদ্ধতি অনুমোদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সমাধানের মূল সূত্রগুলি এইরকম—

ক. তৎসম শব্দের বানানে প্রচলিত বানান বজায় থাকবে।

খ. তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী হবে।

গ. সাধুভাষার ক্রিয়ায় প্রচলিত বানান আর চলতিভাষার ক্রিয়ায় উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হবে।

২. সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ (ভাদ্র ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথকে লেখা শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষের এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথেরই বানান প্রয়োগে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখবার চেষ্টা আছে—

ক. 'বস্তুতঃ অন্ততঃ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ প্রায়শঃ প্রভৃতি শব্দগুলিতে আপনি বিসর্গ যোজনা করেন না; কিন্তু 'ক্রমশঃ'র ডাম্‌বেল্‌টা (অর্থাৎ 'ঃ') 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায়-ও ঝুলিতেছে, আপনার লেখার নীচেই।'

খ. 'ও-কার ব্যবহারে আপনার লেখায় কোনো শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না। হ'ল, ছিল, কিন্তু—এলো।'

গ. 'আপনার শব্দতত্ত্বে আপনি বাংলায় কোথা-ও দীর্ঘ-ঈ স্বীকার করেন নাই, এমনকি স্ত্রীলিঙ্গেও না; সর্ব্বত্রই হ্রস্ব-ই—মাসি, খুড়ি, বুড়ি, মালিনি.....কিন্তু আপনার (আধুনিক) লেখায়ই বহুস্থলে, 'কালী (Ink) , পাখী, গাড়ী, আমদানী পাইয়াছি;

ধ্বনি আর বর্ণের অসংগতি যে বানানের এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী, একথাও মণীন্দ্রবাবু এ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—

ক. 'ভাষার অসংখ্য উচ্চারণ, কিন্তু বাংলাভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তার অর্দ্ধেক চিহ্ন বা অক্ষর নাই।'

খ. 'শব্দতত্ত্বে আপনি জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন মাত্র। বিচার বা মীমাংসা করে নাই।'

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে জানান—

ক. 'চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্য অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।'

খ. ‘যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্ছে সেইজন্যে অনেক নতুন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক।’

৩. মার্চ ১৯৩৪-এর (ফাল্গুন ১৩৪০) ‘বিচিত্রা’-য় লেখা ‘বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ’ প্রবন্ধে সুধীর মিত্র যেকোনো ভাষার বানান-সমস্যার মূল কারণ হিসেবে দায়ী করেন বর্ণ-ধ্বনির অসমতাকে—‘হয় একই বর্ণের সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনিকে রূপ দিতে হয়, আর না হয় কয়েকটি বর্ণ বিভিন্ন স্থলে একই ধ্বনির বাহন হইয়া থাকে—ফলে, বানান প্রক্রিয়া ভাষায় জটিলতর হইয়া উঠে।’ আর, বাংলা বানানের জটিল হয়ে ওঠার কারণ তাঁর কথায় ‘বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে একই ধ্বনি’-র উচ্চারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর উল্লেখ—ণ-ন শ-ষ-স ই-ঈ উ-ঊ জ-য অন্তস্থ ব-ফলার ব।

অতএব, বানান-সমস্যার সমাধানের জন্য সুধীরবাবুর সুপারিশ এইরকম—‘উপরিউক্ত প্রত্যেকটি জোড়া হইতে এক একটি বর্ণ রাখিয়া অতিরিক্তগুলিকে বাদ দিতে পারিলে বানানসমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া উঠে। .....আমাদের মনে হয়, উপরিউক্ত বর্ণগুলির মধ্য হইতে ন স ই উ এবং জ-কে রাখিয়া বাকীগুলিকে.....বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।’

বর্ণ-ধ্বনির অসমতা থেকে তৈরি বানান-সমস্যা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মতো বড়ো লেখককেও কীভাবে জর্জরিত করেছে, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সুধীরবাবু তুলে ধরেছেন—

ক. ‘রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘শেষের কবিতা’য় কয়েকটি বানান এইরূপ করিয়াছেন; যথা—যতো ততো কতো ছিলো গেলো হলো করবো বলবো ইত্যাদি—অথচ তৎপরবর্তী বহু রচনায় দেখিলাম.....‘হলো’র পরিবর্তে ‘হোলো’, ‘ছিলো’র পরিবর্তে ‘ছিল’, ‘কতো’র পরিবর্তে ‘কত’; ‘করবো’-র স্থলে ‘করব’ ইত্যাদি এইরূপ বহু বানানের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।’

খ. ‘রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বুদ্ধদেব বসু.....অনেক সময় দেশজ ও বৈদেশিক শব্দে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বানান চালাইয়া থাকেন—কেহ কেহ লেখেন—খুসী গাড়ী সিল্ক শাড়ী জিনিস মুখোস.....কেহ কেহ লেখেন—খুশী গাড়ি শিল্ক সাড়ী জিনিষ মুখোশ’.....

৪. ৮ মার্চ ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘বাংলা বানান সমস্যা’ প্রবন্ধে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ (ছদ্মনাম ‘ভাস্কর’) লিখলেন ঃ ‘বাংলাভাষায় বিভিন্ন লেখক যাহা লিখিয়া থাকেন

এবং একই লেখক বিভিন্ন সময়ে যাহা লেখেন, তাহার বানান ঠিক একরূপ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ বহু শব্দ সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতার জন্য এই সকল শব্দের শুদ্ধ বানান সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের নিকট অতিশয় কঠিন। বানান শুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধতা যে বহুপ্রকার হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? দ্বিতীয়তঃ প্রায় সমান উচ্চারণযুক্ত বর্ণের বাহুল্যও একটি প্রধান কারণ। শ, ষ,স,ণ,ন,ই,ঈ প্রভৃতির পার্থক্যরক্ষা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ নহে। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত নয় এরূপ বহু এদেশীয় ও বিদেশীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদের বানান সম্বন্ধে কোন ব্যাকরণ রচিত হয় নাই, সুতরাং যখন যাঁহার যাহা খুসী, তখন তিনি তাহাই লিখিতেছেন। .....এরূপ বিশৃঙ্খলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।'

অধ্যাপক ঘোষ এখানে বাংলা বানানের দু-রকম সমস্যার কথা জানালেন—তৎসম আর অ-তৎসম শব্দ-বানানের সমস্যা। তৎসম এসেছে সরাসরি সংস্কৃত চেহারা নিয়ে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র এসব বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃত বানান যার অজানা, তৎসম বানানে তার ভুল হবেই। আর, এ ভুল নানারকম চেহারায় লেখা হতে থাকবে। কেননা, বাংলায় একই ধ্বনির জন্য তৈরি রয়েছে একাধিক বর্ণ—শ-ষ-স ণ-ন ই-ঈ এইরকম। 'সবিশেষ' লিখতে গিয়ে লেখা হতে পারে যবিসেশ-শবিষেস-সবিষেশ, 'বর্ননা' অথবা 'বর্ণনা' এই নিয়ে দ্বিধা, 'পৃথিবী' আর 'পৃথীবী'-র মধ্যে বিভ্রান্তি। অ-তৎসম শব্দের একটি ভাগ এসেছে সংস্কৃত থেকে চেহারা বদল করে (অর্ধ-তৎসম আর তদ্ভব), আর একটি ভাগ এসেছে এদেশেরই কোনো ভাষামূল থেকে (দেশি), তৃতীয় ভাগ এসেছে বিদেশের কোনো উৎস থেকে (বিদেশি)। এসব শব্দ-বানান নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো ব্যাকরণ বা সূত্র নেই। অতএব, যেমন-খুশি বানানের যথেচ্ছাচার চলছে অ-তৎসম বানানে। তৎসম শব্দ-বানানে বিভ্রান্তি আর অ-তৎসম শব্দ-বানানে যথেচ্ছার—মূলত এই দুটি সমস্যার উল্লেখ এখান থেকে পাওয়া গেল।

সমস্যা-দুটির সমাধান কী হতে পারে, এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক ঘোষের মনে হয়েছে—'একখানি মাঝারি আকারের অভিধান প্রণয়নই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান....। রাজশেখর বাবুর 'চলন্তিকা' বা ঐ প্রকার কোন একখানি অভিধান অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। প্রত্যেকটি শব্দ ধরিয়া তাহার বানান এবং লিখন-রীতি বাঁধিয়া দিতে হইবে।' এর সঙ্গে আর-একটি পররামর্শ তিনি যোগ করেছেন—'এইরূপ

অভিধান প্রণীত হইলে, তাহারও সংস্কারের আবশ্যক হইবে। দশবছর অন্তর একবার সংস্কার করিলেই চলিতে পারে।'

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৪ এপ্রিল ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাংলা বানান সমস্যা' প্রবন্ধে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষের প্রস্তাব সমর্থন করে লিখলেন—'তিনি যে মাঝারি আকারের একটি অভিধান রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই এ সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়।'

৫. ১৩৩৯-এর 'বিচিত্রা'-য় রবীন্দ্রনাথ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা নিয়ে বলেছিলেন—'তিনটে 'শ', দুটো 'ন' ও দুটো 'জ' শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে.....এ ছাড়া দুটো 'ব'-য়ের মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ, ৯, ঙ, ঞ এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। .....সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় হ্রস্বদীর্ঘ স্বর।'

এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করতে গিয়ে চৈত্র ১৩৪২-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'চলিত ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধে রাধারানি দেবী-নরেন্দ্র দেব লিখলেন—'চলিত ভাষার সংস্কার তথা বানান নিরূপণে নিযুক্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলা বর্ণমালা সংক্ষেপ করা। কারণ, বানানের ভিত্তি বর্ণমালার উপরই নির্ভর করে।' বর্ণ-সংক্ষেপের নমুনা হিসেবে এঁরা 'বর্ণপরিচয়'-এর মোট ৫৪টি বর্ণ থেকে বাছাই করলেন ৩৬টি (স্বরবর্ণ ৬, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩০), ছাঁটাই করলেন ৩০টি যুক্তবর্ণ, ২১টি স্বর-ব্যঞ্জন-চিহ্নের বদলে ১০টি চিহ্ন বরাদ্দ করলেন।

৬. এরপর ৮মে ১৯৩৬-এ 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন—

'বাংলাভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিতভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যেসকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।' দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ বাংলা বানানের যে মূল সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন, উপাচার্যের কণ্ঠে শুনি তারই প্রতিধ্বনি।

এই সমস্যার সমাধান-সূত্র বের করার দায়িত্ব দেওয়া হল বানান-সংস্কার-সমিতিকে, যার কাজ হবে উপাচার্য মুখোপাধ্যায়ের কথায়—'যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সেসকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা।'

বানান-সংস্কার-সমিতির প্রতিবেদনে বলা হল ঃ

১) বানান যথাসম্ভব সরল উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২) উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য, এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। কেননা, প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ অর্থ থেকেই বুঝে নেওয়া সম্ভব। গণ-বন-ঘন-অশ্ব-হ্রস্ব একদা-একটা চেনা-দেখা—এসব শব্দের বানানে আর উচ্চারণে মিল না থাকলেও বানান নিয়ে সমস্যা নেই।

৩) নবাগত বা অল্প-পরিচিত বিদেশি শব্দের বাংলা রূপ এখনও নির্ধারিত হয় নি। এসব শব্দের বানানের সরল সহজ নিয়ম গঠন করা আবশ্যক।

৪) সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ ঠিক নয়।

৫) কেবল বর্তমান লেখক-পাঠকের কথা নয়, ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে নিয়ম গঠন করা আবশ্যক।

৬) শব্দকোষ ভিন্ন বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব।

৭) ভাদ্র ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রবন্ধে শ্রীগোবর্ধনদাস শাস্ত্রী তিনটি বানান-সমস্যার উল্লেখ করলেন—

১) একই উচ্চারণের অর্থভেদে নানাপ্রকারের বানান। যথা—বিনা-বীণা দুর-শূর কৃত-ক্রীত বৈ-বই-শণ-সন বিশ-বিষ শাল-সাল।

২) একই বানানের অর্থভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ। যথা—বল ভাল কাল মত করান।

৩) একই বর্ণের শব্দভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ। যথা—মোট-ছোট, গরিব-করিব।

তিনটি সমস্যাই মূলত বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা। প্রথমটিতে একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টিতে একই বর্ণের উচ্চারণে একাধিক ধ্বনি। প্রথম সমস্যাটি দূর হতে পারে একটি বর্ণ রেখে বাকি বর্ণ ছাঁটাই করে, অথবা প্রতিটি পৃথক বর্ণের সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত উচ্চারণ ঠিক ঠিক শিখে নিয়ে। যতদিন এর কোনওটিই

কার্যকর হচ্ছে না, ততদিন সমস্যাটি সহ্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন লেখক। দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি আসলে শব্দশেষে হস্-অ-ও উচ্চারণের সমস্যা। লেখকের মতে এর সমাধান হতে পারে এইভাবে ঃ

১) হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনওখানেই শেষের অ-কার উচ্চারিত হবে না, অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে শব্দশেষে হস্ উচ্চারণ হবে বল্-ভাল্-কাল্-মত্-করান্-মোট্-গরিব্।

২) হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনওখানে শেষের অ-কার উচ্চারণ করতে হলে শেষে ও-কার দিয়ে লিখতে হবে। অর্থাৎ, বানানে বলো-ভালো-কালো-মতো-করানো-ছোটো-করিবো লিখলে তবেই তার উচ্চারণ হবে বল-ভাল-কাল-মত-করান-ছোট-করিব।

৩) শব্দশেষে হ এবং যুক্তবর্ণ থাকলে তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই অ-এর উচ্চারণ হবে (দেহ-অহরহ-রক্ত-কাণ্ড-গঞ্জ)। তবে অ-এর উচ্চারণ না চাইলে বানানে হস্‌চিহ্ন দিতে হবে (বাদশাহ্ আর্ট্ বণ্ড্ স্পঞ্জ্)।

৮. অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা 'বাঙ্গালা বানান-সমস্যা' প্রবন্ধে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যাটি উদাহরণসহ তুলে ধরলেন এইভাবে ঃ

ক. 'সংস্কৃতের বর্ণমালা বাঙ্গালায় চালাইতে গিয়া, আমরা সকল স্থানে ধ্বনিগত বানান রাখিতে পারি নাই এবং কোথায় কোথায় অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছি।.....একই এ-কার দ্বারা দুই পৃথক্ ধ্বনি সূচিত করিতেছি—এক-এস কেন-বেশ। অন্যদিকে জল-যম শব্দে জ-য; গণ-বন শব্দে ণ-ন, বিশ-মেষ-দাস শব্দে শ-ষ-স-এর একই ধ্বনি, অথচ আমরা সংস্কৃতের অনুসরণে বিভিন্ন বর্ণদ্বারা এই শব্দগুলির বানান করি।'

খ. 'অনেক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় উচ্চারণ বিকৃতি ঘটিয়াছে; কিন্তু আমরা সংস্কৃত বানানের ফাঁক দিয়া আমাদের ভ্রষ্ট উচ্চারণ ঢাকিয়া রাখি। উদাহরণ.....জ্ঞান ক্ষার লক্ষ্মণ পদ্ম।'

গ. 'যে সকল সংস্কৃতভব শব্দ বাঙ্গালায় আছে, তাহাদের বানান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কেহ লিখেন কাণ, কেহ, কান; কেহ সোণা, কেহ সোনা; কেহ কাজ, কেহ কার্য.....।'

ঘ. 'দেশী ও বিদেশী শব্দেও একরূপ বানান নাই। কেহ বানান করেন জিনিষ, কেহ জিনিস; কেহ সহর, কেহ শহর; কেহ খ্রিষ্ট, কেহ খ্রীষ্ট, আবার কেহ লিখেন খৃষ্ট।'

ড. শহিদুল্লাহ দেখালেন, এক-এস কেন-বেশ শব্দ-বানানে একই এ-কার দিয়ে দুটি পৃথক ধ্বনি নির্দেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাত এখানে ১:২। অন্যদিকে

জ-য দুটি বর্ণ দিয়ে একই ধ্বনি বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ, জল-যম বানানে এই অনুপাত ২:১, গণ-বন বানানেও ২:১, বিশ-মেষ-দাস বানানে ৩:১। তাঁর মতে, তৎসম শব্দের (জ্ঞান-ক্ষার-লক্ষ্মণ-পদ্ম) উচ্চারণ বদলে গেছে, অথচ বানান সংস্কৃত ব্যাকরণকেই মেনে চলছে। সংস্কৃতভব বা তদ্ভব শব্দের বানানে চলছে যথেচ্ছাচার—কাণ-কান সোণা-সোনা কাজ-কায। এটাও মূলত বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা (ণ-ন : ন, জ-য : জ)। একই সমস্যা দেশি-বিদেশি শব্দের বানানেও—জিনিষ-জিনিস (ষ-স : ষ), সহর-শহর (স-শ : শ), খ্রিষ্ট-খ্রীষ্ট-খৃষ্ট (ই-ঈ : ই, রি-রী-ঋ : রি)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটিতে দেওয়া সমাধান-সূত্রগুলি ড. শহিদুল্লাহ সাধারণভাবে সমর্থন করলেন। তবে সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট প্রস্তাবও তার পাশাপাশি রাখলেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত এইরকম ঃ

১) কোনও শব্দ-বানানেই বিকল্প থাকবে না, প্রতিটি শব্দের বানান হবে একটিমাত্র নির্দিষ্ট বানান।

২) তৎসম শব্দ-বানান উচ্চারণ মেনে হওয়াই উচিত, তবে বাস্তব কারণে কার্যত সংস্কৃত বানানকেই মেনে চলতে হবে।

৩) অ-তৎসম শব্দ-বানানে কেবল ই উ ন থাকবে (পাখি-উনিশ-কান), শ-ষ-স-এর বদলে কেবল শ থাকবে, দুটি-একটি বানানে বড়োজোর স-ও থাকবে (আশে-বশে-সোয়)। তবে, বিদেশি শব্দে শ-স থাকতে পারে।

৪) বিদেশি শব্দে Z ধ্বনির জন্য য ব্যবহার চলতে পারে। তবে, তদ্ভব শব্দে কেবল জ থাকবে (জাওয়া-জা-জে-জিনি-জুঁই)।

৫) তদ্ভব শব্দে ঐ ঔ থাকবে না (খই-দই-বউ-মউ)।

৬) তদ্ভব শব্দে ক্ষ থাকবে না (খুর-খেত-খুদ-খেপা)।

অর্থাৎ ড. শহিদুল্লাহ্-র মতে যেকোনও বাংলা শব্দের বানান হবে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট, বর্ণ-ধ্বনির আদর্শ অনুপাত হবে ১ : ১—প্রতিটি ধ্বনির জন্য একটি নির্দিষ্ট বর্ণ। আর, বানান হবে যথাসাধ্য উচ্চারণ-অনুসারী।

৯. পৌষ ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রবন্ধে বানান-সংস্কার-সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসু বাংলা বানানের নতুন নিয়ম প্রচলনের সমস্যা নিয়ে দু-চার কথা জানালেন। তাঁর ধারণা—

১) 'যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নন তাঁরা অপ্রিয় নিয়ম মানবেন না, অভ্যস্ত বানানই চলাবেন।'

২) 'যুক্তি-তর্কের সময় যাঁরা বৈজ্ঞানিক জেদ অবলম্বন করেন, ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁরাই স্বচ্ছন্দে নানারকম অসংগতি মেনে নিয়ে চলেন। .....যিনি মাসী পিসী লিখতে চান তিনি দিদী ঝী লিখতে রাজি নন....।'

এসব সমস্যার সমাধান তিনি নির্দেশ করছেন এইভাবে—'বানানের সমস্যা কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিটবে না। সাধারণের অভ্যাস আর রুচি দেখতে হবে, বহু অসংগতি মেনে নিতে হবে।' বানান-সমিতির সদস্যরাও নিজেদের মতভেদ সরিয়ে রেখে সমস্যা-সমাধানের এই পথ বেছে নিলেন—

১) বানানের সংস্কার যত হোক না হোক, নির্ধারণ আবশ্যক।

২) বানান যতটুকু সরল করা সম্ভবপর, তা করা উচিত।

৩) প্রথম উদ্যমে সমস্ত শব্দের বানান নির্ধারণ করা অনুচিত, এ চেষ্টা ক্রমে ক্রমে করাই ভালো।

এঁরা বুঝেছিলেন, সমকক্ষ বিরুদ্ধ মতামতকে সমান মূল্য দিতে গিয়ে কিছু কিছু বিকল্প বানান মানতেই হবে (কুমির-কুমীর উনিশ-ঊনিশ), এমনকী দুটি-একটি অসংগত ব্যবস্থাও মেনে নিতে হবে সমাধানের কথা ভেবে—ণ-বর্জিত কান-সোণার পাশে শ-য-স অব্যাহত থাকছে মশা-সরিষা-মিনসে বানানে।

১০. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির ২২ দফা বানান-সূত্রকে মাঝখানে রেখে রবীন্দ্রনাথ আর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের মধ্যে বাংলা বানান নিয়ে একটি বিতর্ক জমে উঠেছিল চিঠিপত্র লেখালেখির মাধ্যমে। সময়টা ১৯৩৭-এর জুন থেকে আগস্ট। তা থেকে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের দুটি-একটি নির্দেশ আপনি পেয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় পরে আসছি। দেখা যাক, এ বিষয়ে দেবপ্রসাদবাবুর নির্দেশ কীরকম। অধ্যাপক ঘোষ লিখলেন—

১) বাংলা বানান মোটামুটি উচ্চারণ মেনেই চলছে। এদিক থেকে বানানে তেমন বিশৃঙ্খলা নেই, সমস্যাও নেই।

২) বানান-সমস্যার মূল কারণ একাধিক বর্ণের একই ধ্বনি, একবর্ণের একাধিক ধ্বনি নয়। সংস্কৃত বর্ণমালার ধ্বনি বিকৃত উচ্চারণ নিয়ে বাংলাভাষায় ঢুকেই এ গোলমাল

ঘটিয়েছে। দুই ন, তিন শ, দুই জ, দুই ব, ই-ঈ, উ-ঊ—এদের উচ্চারণ বাংলায় একই। সংস্কৃত স্বরবর্ণ 'ঋ-৯' বাংলা উচ্চারণে ব্যঞ্জনধ্বনি 'রি-লি'।

৩) তবু, সাধু বাংলায় এ বিষয়ে কোনো অরাজকতা নেই,.....কেবল যেসব শিষ্টপ্রয়োগ দু-রকম বানান দেখা যায় (সাদা-শাদা সহর-শহর জিনিষ-জিনিস), সেক্ষেত্র বড়োজোর একরকম বানান সুপারিশ করলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৪) যেসব নিয়ম বহুপ্রচলিত তাকে বাতিল না করে বরং আরও যথাসম্ভব 'extend' করলে, এমন-কী নিয়মের বাইরেও কোনও সুপ্রচলিত বানানকে 'disturb' না করলে বানান-সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।

৫) সাধু বাংলায় সমস্যাটা কম হলেও মৌখিক বা কথ্য বাংলায় বিশৃঙ্খলা একটা বাস্তব সমস্যা। কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে উচ্চারণ নানারকম, অতএব সেসব উচ্চারণকে বানানে ধরতে গেলে বানানও হবে নানারকম। এর সমাধানের প্রথম ধাপ কথ্যভাষার 'রূপগুলি যথাসম্ভব 'Standardise' করা'—করলাম-করলেম-করলুম অথবা করান-করানো পাঠান-পাঠানো থেকে একটি রূপ বেছে নেওয়া।

১১. এবার রবীন্দ্রনাথের কথা শুনুন। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনাও মূলত কথ্যভাষার (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাকৃত বাংলা') শব্দের বানান নিয়ে। ১৯৩৭-এর জুন মাসে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন—'প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর সম্বন্ধে বানান স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ্‌চে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম।' 'বানান স্বেচ্ছাচার' নিয়ে তাঁর এই দুশ্চিন্তা তৎসম সম্পর্কে ততটা নয়, যতটা অ-তৎসম শব্দ-বানান সম্পর্কে। তৎসম শব্দ বানানে সংস্কৃত হলেও উচ্চারণে প্রাকৃত (যেমন, বানানে 'বৃক্ষ' উচ্চারণে 'ব্রিক্‌খ'), এই স্ব-বিরোধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিচ্ছেন। কেননা, 'প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার' তাঁর নেই, যা দিয়ে এ অসংগতি দূর করা তাঁর নিজের পক্ষেই সম্ভব হত। কিন্তু, তদ্ভব শব্দ-বানান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট—'প্রাকৃত বাংলায় তদ্ভবশব্দবিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল।'

কথ্য বাংলার বানান-সমস্যা আর তার সমাধান-নির্দেশ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা আর-একটি চিঠিতে (২৬ জুন ১৯৩৭) আরও স্পষ্ট হল—'প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু, প্রাকৃত

বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি,..... কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ সুরু করবার সময় এসেছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, বানান-সমস্যার এলাকা সাধু বাংলা ত নয়-ই, এমনকী কথ্য বা প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত 'সংস্কৃত অংশ' বা তৎসম শব্দও নয়, কেননা বানান এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ মেনে এখনও চলছে। বানান নিয়ে যেকোনও সংশয় দূর করতে 'হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান'-ও রয়েছে। বানান-সমস্যার মূল এলাকা অবশ্যই কথ্য বা প্রাকৃত বাংলার অ-তৎসম (বিশেষ করে তদ্ভব) শব্দ। এর সমাধানের দুটি ধাপ—প্রথম ধাপে অ-তৎসম শব্দে বানানসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে প্রতিটি শব্দ-বানানকে প্রামাণিক করে তোলা, দ্বিতীয় ধাপে সেইসব শব্দ-বানানকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা। প্রথম ধাপের কাজটি শুরু হওয়ার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিঠিতে আমরা পাচ্ছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি সেই কাজটিই করেছে।

১২. দেখা গেল, ১৯৩৬-৩৭-এর সময়টা বানান নিয়ে নানারকম বিতর্ক জমে ওঠার সময়। বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করার উদ্যোগ থেকেই এ সময় বেরিয়ে এল বানান-সংস্কার-সমিতির ২২-দফা নিয়ম। কিন্তু তবু বাংলা বানানের সমস্যা চিরকালের জন্য মিটে যায় নি। এসব চিন্তাভাবনার রেশ চলতে চলতে দু-তিন দশক পেরিয়ে গেল। বিশ শতকের ছ-সাতের দশকে এ নিয়ে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ—একটি নভেম্বর ১৯৬৫-তে লেখা 'বানান-সমস্যা', আর-একটি অক্টোবর ১৯৭৯-এ লেখা 'বাংলা বানান-সমস্যা'।

বানান-সমস্যা নিয়ে মণীন্দ্রবাবুর প্রথম বক্তব্য সরাসরি তাঁর কথাতেই জেনে নিন—'সমস্যা প্রধানতঃ চলিতভাষার বানান নিয়ে। অনেকের ধারণা.....মুখের উচ্চারণকে লেখার বানানে রূপ দেওয়াই বানানের চূড়ান্ত সার্থকতা।' কিন্তু, মুখের সব উচ্চারণকে বানানে রূপ দেওয়া বাংলা বর্ণমালার পক্ষে অসাধ্য। কেননা, বাংলা বর্ণের সংখ্যা নির্দিষ্ট, মুখের উচ্চারণ অসংখ্য, অনির্দিষ্ট। সেই কারণে, বানান-সমস্যার সমাধানের জন্য মণীন্দ্রবাবুর পরামর্শ—'মুখের উচ্চারণকে লেখার বানানে রূপ দেওয়াই বানানের চূড়ান্ত সার্থকতা'—এই ভুল ধারণাটা গোড়াতেই ভেঙে দেওয়া হোক, অর্থাৎ বানানকে উচ্চারণমুখী করার প্রবণতা থেকে যাক।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য—'বানান দিয়েই শব্দার্থ প্রকাশ করতে হবে। তার সঙ্গে যদি শব্দের ধ্বনি-প্রকাশও করতে পারি তা হবে বানানের অন্যতম গৌরব।' মণীন্দ্রবাবু বলতে চান, ধ্বনির উচ্চারণ মেনে শব্দের বানান তৈরি অনাবশ্যক, তবে অর্থের ভেদ মেনে

শব্দের বানান তৈরি হলে অর্থবোধেও সুবিধে, বানান-সমস্যাও এড়ানো সম্ভব। তাঁর কথায়—'মত' আর 'মতো'র দুই বানান থাকলে অর্থের জন্য ভাবতে হয় না।' (এ যে আমার **মত**। এ যে আমার **মতো**।)

এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্রবাবু সবচেয়ে বেশি চিন্তিত 'কি-কী' বানান নিয়ে। তাঁর কথায়—'তুমি কি খাবে? ....বাক্যে অর্থ স্পষ্ট নহে। তুমি খাবে কিনা, কিংবা কোন্ বস্তু খাবে.....দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে। কিন্তু বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য ঘটাইলে অর্থবোধে কোন বাধা থাকে না।'

মণীন্দ্রবাবুর প্রথম বক্তব্যে রয়েছে বাংলা বানানে বর্ণ-ধ্বনির প্রতিসাম্যের সমস্যার ইঙ্গিত, দ্বিতীয় বক্তব্যে আছে সমধ্বনির উচ্চারণে অর্থভেদে পৃথক বানান-প্রয়োগ বানান-সমস্যা এড়াতে কতটা কার্যকর তা নিয়ে ভাবনা। এর পাশে বানান-সমস্যা নিয়ে মণীন্দ্রবাবুর তৃতীয় বক্তব্যটি এইরকম—'ব্যক্তিভেদে স্থানভেদে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য সর্বত্র দেখা যায়। কালের পরিবর্তনেও উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়।.....আদর্শ উচ্চারণ বলে যখন কিছু নেই, উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান দিতে গেলে যথেচ্ছাচার আসবেই।....বানান স্থিতিশীল হবে না। বানান স্থিতিশীল রাখার একমাত্র উপায় শব্দের উৎস-সন্ধান।'

সমস্যাটা বোঝাতে গিয়ে উদাহরণ টেনে টেনে মণীন্দ্রবাবু বলছেন, ঢাকা-বরিশাল-মেদিনীপুর -পুরুলিয়া তো বটেই, এমনকী শান্তিপুর-শান্তিনিকেতন-বাগবাজার-কালীঘাটের ছোট্ট ভূখণ্ডেও উচ্চারণ নানারকম। একই কলকাতার বাসিন্দা হয়েও রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার-চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা দানিবাবু-তিনকড়ি চক্রবর্তী-তারাসুন্দরীর উচ্চারণেও বিস্তর অসামঞ্জস্য। একই ব্যক্তির উচ্চারণও কালে কালে বদলায়। উচ্চারণ মেনে বানান লিখতে গেলে ব্যক্তি-স্থান-কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বানানের অজস্র রূপান্তরে যথেচ্ছাচার আর বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই অস্থিরতার মধ্যে বানানে সাম্য আনা হবে অসাধ্য।

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে মণীন্দ্রবাবুর পরামর্শ—শব্দের উৎস সন্ধান করে সেই উৎস বা ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী প্রতিটি শব্দের বানান নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক।

অতএব দেখা গেল, সাধারণভাবে মণীন্দ্রবাবু বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী করার বিরোধী, ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী করার পক্ষপাতী। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ-পার্থক্য বোঝার সহায়ক হলে বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী করতে তাঁর আপত্তি নেই (মত-মতো কি-কী)।

১১৩.৪.১ সারাংশ—২

১৯২৫ থেকে ১৯৭৯, এই সময়ের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ পর্যন্ত বানান-ভাবুকেরা বাংলা বানানের সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা করেছেন, তা থেকে এই কটি তথ্য বেরিয়ে আসে, এক এক করে লক্ষ করুন—

১. সাধু বা শিষ্ট বাংলা ভাষার শব্দ-বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ দেখিয়েছেন, তৎসম বানানভুলের কারণ মূলত সংস্কৃত-জ্ঞানের অভাব। তৎসম বানান নিয়ে যেটুকু সমস্যা, তার সমাধানে দেবপ্রসাদ ঘোষ সুপারিশ করেছেন সুপ্রচলিত বানানকে অব্যাহত রাখার।

২. কথ্যবাংলার অ-তৎসম শব্দ-বানানের মূল সমস্যা তার নানারকম চেহারা, একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর সমাধানে তাঁদের সুপারিশ—বানানের অসমতা দূর করে বানানকে নির্দিষ্ট করা, আর ঐ নির্দিষ্ট বানানকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ অ-তৎসম বানানের আর-একটা সমস্যার কথা বলেছেন—তা হল অ-তৎসম বানানের ব্যাকরণের অভাব। এর সমাধানে তিনি সুপারিশ করলেন ব্যাকরণের বিকল্প হিসেবে আপাতত নির্দিষ্ট বানানের এমন একখানি মাঝারি আকারের অভিধান, যা দশবছর অন্তর সংস্কারযোগ্য।

৪. বানানের নতুন নিয়ম প্রচলনের সমস্যার কথা বলেছেন রাজশেখর বসু। এর সমাধানে তাঁর সুপারিশ—বানান নির্দিষ্ট হবে, বানানের নির্ধারণ হবে ক্রমশ ধাপে ধাপে, আর কিছু কিছু অসংগতি মেনেও নিতে হবে।

৫. বাংলা বানানের মূল সমস্যাই যে ধ্বনি-বর্ণের অসমতা আর অসংগতি এটা মেনে নিয়েছেন বানান-ভাবুকেরা সবাই। ধ্বনি-বর্ণের অসমতা প্রধানত দু-ধরনের—

(ক) একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ ঃ 'এ' বর্ণে'র উচ্চারণ 'অ্যা' আর 'এ'।

(খ) একাধিক বর্ণের একই ধ্বনি ঃ ই-ঈ, উ-ঊ, ঞ-ণ-ন, জ-য, শ-ষ-স বর্গীয় ব-অন্তস্থ-ব।

ক-চিহ্নিত অসমতা দূর হতে পারে নতুন ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ রচনা করে। খ-চিহ্নিত অসমতা দূর করার জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত বর্ণগুলির উচ্ছেদ—ধরা যাক, ঈ-ঊ-ঞ-ণ-য-ষ-অন্তস্থ ব-এর উচ্ছেদ।

ধ্বনি-বর্ণের অসংগতি মূলত অ-ও, ঐ-অই, ঔ-অউ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, শব্দশেষে

বিসর্গ (তস্-শস্ প্রত্যয় থেকে) নিয়ে। এর সমাধান নিয়ে অবশ্য এ-পর্বের ভাবুকদের মধ্যে বিতর্ক ছিল।

১১৩.৪.২ অনুশীলনী—২

১. ১৯২৫ থেকে ১৯৭৯—এই সময়ের মধ্যে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের উপায় নিয়ে যেসব প্রস্তাব তোলা হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলি সংকলন করুন।

২. সমকালীন বানান-ভাবুকদের সঙ্গে বিতর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বানান-সমস্যা আর তার সমাধান প্রসঙ্গে যেসব মতামত প্রকাশ করেছিলেন, সংক্ষেপে তা বিবৃত করুন।

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত হবার পরে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে যেকোনও একজনের বক্তব্য সংক্ষেপে পরিবেশন করুন এবং আজকের প্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন করুন।

৪. বাংলা বানানের অন্যতম সমস্যা হিসেবে ধ্বনি-বর্ণের অসংগতির প্রসঙ্গটি কীভাবে আলোচিত হয়েছে, বিবৃত করুন।

১১৩.৫ মূলপাঠ—৩ ঃ বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯৮২ থেকে ২০০১)

বানান-সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র নিয়ে প্রথমে বিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত যেসব ভাবনা চলছিল, তার খানিকটা হদিস এতক্ষণে পেলেন। এবারে এগিয়ে যাব আশি-নব্বই-এর দশকের বানান-ভাবনায়। এই সময়ের মধ্যে বানান-সমস্যার ভাবনা আর তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার উদ্যোগকে ক্রমশ একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিণামে উত্তীর্ণ হতে দেখছি। তিরিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বানান-সংস্কার-সমিতি যে দায়িত্ব নিয়েছিল, আশি-নব্বই-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলা আকাদেমির বানান সমিতি অনেকটা সেইরকম ভূমিকাই নিল, এমনকী তার চেয়ে একটু বেশি কাজই করল। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় বের করেছিল কেবল 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটি, আর বাংলা আকাদেমি 'বানানবিধি'-র সঙ্গে বের করে দিল বিধিসম্মত বানানের একটি গোটা অভিধান'—'আকাদেমি বানান অভিধান'।

বাংলা বানানের সমস্যার দিকটা চিহ্নিত করার কাজে ১৯৩৬-৩৭-এর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই এগিয়েছিল, কিন্তু সংস্কার-করা বানানের প্রচলনে ততটা এগোতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিধান বানানকে সরল করেছে, কিন্তু বেশিমাত্রায় বিকল্পের সুযোগ রেখে কিছু কিছু সমস্যাকে জিইয়েও রেখেছে। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রেই একই শব্দের একের বেশি রকম বানান লেখার অধিকার এখনও থাকছেই, যেমন-খুশি লেখার সুযোগ খানিকটা কমলেও পুরোপুরি মুছে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে সম্পূর্ণ করা না গেলেও অন্ততপক্ষে খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এল বাংলা আকাদেমির বানান সমিতি।

বাংলা আকাদেমি বানান-সমস্যার সমাধানে কাজ শুরু করল ১৯৮৬ সালে। এর ঠিক আগের কয়েকটি বছরে এ নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ তুলে আনছি আপনার সামনে, লক্ষ করুন—

১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বানান-সমস্যা বিষয়ে লেখা কিছু প্রবন্ধের সঞ্চয় নিয়ে বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার বের করলেন 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' নামে দু-শ পৃষ্ঠার একখানি বই। বইটির গোড়াতেই অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, বাংলা বর্ণমালা আর তার বানান-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতি পাঁচ রকমের এবং তা থেকে বানান-সমস্যাও তৈরি হয় পাঁচ রকমের—

(১) ধ্বনি আছে কিন্তু তা লেখার মতো কোনও বর্ণ নেই (অ্যা)।

(২) বর্ণ আছে কিন্তু তার উচ্চারণ লুপ্ত, ফলে একই ধ্বনির একাধিক প্রতীক (ই-ঈ উ-ঊ ঋ-রি ণ-ন ঙ-ং জ-য শ-ষ-স)।

(৩) একই বর্ণের যৌগিক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ (ঐ=ও-ই, ঔ=ও-উ)।

(৪) একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ—যেমন, 'অজয়' শব্দে 'অ'-এর উচ্চারণ 'অ', কিন্তু 'অরুণ' শব্দে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'।

(৫) একই ধ্বনি-চিহ্নের একাধিক রূপ (Allograph)। যেমন একই উ-ধ্বনিচিহ্নের পাঁচটি রূপ—উ, কু (ক্ + উ), রু (র্ + উ), হু (হ্ + উ), শু (শ্ + উ)।

১-নং অসংগতির একটি উদাহরণ অ্যা-ধ্বনি। বাংলা শব্দে এই-ধ্বনিটি আছে। কিন্তু এর নিজস্ব কোনও বর্ণ নেই বলে অন্য ধ্বনির প্রতীক চিহ্নকে এর বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন একই অ্যা-ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বানানে এসে যায় (এমন-ব্যস্ত-জ্ঞান—এই তিনটি শব্দ-বানানে অ্যা-ধ্বনির জন্য তিনটি চিহ্ন এ-্য-া লক্ষ করুন), অন্যদিকে তেমনি একই বর্ণের বা বর্ণচিহ্নের একাধিক ধ্বনিও মেনে নিতে হয় (এখন-এক্ষুনিতে 'এ', ব্যয়-অব্যয়-ব্যক্তিতে 'য়' আর জ্ঞান-গান-এ 'া' চিহ্নের দুই বা তিনরকমের ধ্বনির উচ্চারণ লক্ষ করুন)।

২ নং অসংগতির কারণ সংস্কৃত বর্ণমালার ছাঁচকে প্রায় অবিকল রেখে বাংলা বর্ণমালা সাজানো হয়েছে, অথচ অনেক বর্ণের উচ্চারণ তার মূল আদল থেকে সরে এসেছে। বাংলা তৎসম শব্দকে সাধারণভাবে সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় নেওয়া হয়েছে, ফলে এসব শব্দের বানান অক্ষতই থেকে গেছে। কিন্তু এদের উচ্চারণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাঙালি ধরনের। সংস্কৃত বর্ণমালায় ই-ঈ বা উ-ঊর পৃথক হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল, বাঙালি উচ্চারণে এই পার্থক্য নেই। সংস্কৃতে জ-য ণ-ন বা শ-ষ-স—এর পৃথক স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল, বাংলায় তা এক হয়েছে গেছে। এর ফলে, বাংলা বানানে একই ধ্বনির জন্য দুটি বা তিনটি বর্ণচিহ্ন দাঁড়িয়ে গেছে। একটি ধ্বনির জন্য একাধিক প্রতীকের এই সম্পর্ককে অধ্যাপক সরকার বলছেন ‘এক-বহু প্রতিসম্পর্ক’। উদাহরণ দেখুন—

একটি ধ্বনি	**একাধিক প্রতীক বা বর্ণচিহ্ন**	**বানান**
ই	ই, ঈ	যদি, নদী (দি-দী)
উ	উ, ঊ	মধু, বধূ (ধু-ধূ)
ঋ	ঋ, রি	ঋতু, রিপু (ঋ-রি)
ঙ	ঙ, ং	অঙ্ক, অংশ (ঙ-ং)
জ	জ, য	জগৎ, যজ্ঞ (জ-য)
ত	ত, ৎ	শ্রীযুত, শ্রীমৎ (ত-ৎ)
ন	ণ, ন	জন, গণ (ন-ণ)
শ	শ, ষ, স	সবিশেষ (শ-ষ-স)

৩ নং অসংগতি ‘ঐ’ আর ‘ঔ’-কে নিয়ে। দুটি ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ ‘ও-ই’ আর ‘ও-উ’। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি দুটি অথচ চিহ্ন একটিই। অধ্যাপক সরকারের ভাষায় এটি ‘বহু-এক সম্পর্ক’, আগেকার সম্পর্কের বিপরীত। এক-বহু সম্পর্কের মতো বহু-এক সম্পর্কও বাংলা বানান-সমস্যার অন্যতম কারণ। বহু-এক সম্পর্কিত ‘ঐ’ থেকে ক্রমশ বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বৈ (ছাড়া) আর বই (পুথি)-এর বানানে, ‘ঔ’ থেকে ক্রমশ সংশয় এসেছে বৌ-মউ মৌ-মউ-এর বানান নিয়ে।

খেয়াল করুন, ৩-নং অসংগতির প্রসঙ্গে ঐ বা ঔ-তে ধ্বনি দুটি, কিন্তু উচ্চারণ একটিই-এবং তা মিলিত বা যৌগিক উচ্চারণ। অর্থাৎ, ৩নং অসংগতি মূলত একটি বর্ণচিহ্নের একটি প্রয়োগেই একাধিক ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ নিয়ে। কিন্তু, ৪-নং অসংগতির কারণ একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ। অর্থাৎ, ৪নং অসংগতি আসলে একটি বর্ণচিহ্নের পৃথক পৃথক প্রয়োগে একাধিক বা পৃথক পৃথক উচ্চারণ নিয়ে। উদাহরণ দেখুন—

বর্ণচিহ্ন	**প্রথম প্রয়োগে উচ্চারণ**	**দ্বিতীয় প্রয়োগে উচ্চারণ**
অ	অত (অ)	অতি (ও)
	অজয় (অ)	অরুণ (ও)
এ	এখন (অ্যা)	এক্ষুনি (এ)
	দেখা (অ্যা)	দেখি (এ)

দেখা গেল, পাশে অন্য ধ্বনি (ই, উ) এসে গেলে অ-বর্ণটির উচ্চারণ 'ও' হতে পারে, আর, অন্য ধ্বনি না এলে এ-বর্ণটির উচ্চারণ 'অ্যা' হতে পারে। তবে, এ ধরনের অসংগতি থেকে বানান-ভুলের আশঙ্কা খুবই কম—'ওতি' বা 'ওরুণ' উচ্চারণের দাবি মেনে 'অতি'-র বদলে 'ওতি' বা 'অরুণ'-এর বদলে 'ওরুণ' লেখার মতো বানান-সমস্যা সাক্ষর বাঙালির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। অবশ্য 'দেখা'-র বদলে 'দ্যাখা' লেখার ঝোঁক তৈরি হতেই পারে।

এই চারটি সমস্যাকে অধ্যাপক সরকার বলছেন বাংলা বর্ণমালার উপাদানের (Content) সমস্যা। ৫নং অসংগতি থেকে আসছে কোনও কোনও বর্ণের রূপের (Form) সমস্যা—একই ধ্বনিচিহ্নের একাধিক রূপের (Allograph) সমস্যা। উদাহরণ দেখুন—

ধ্বনিচিহ্ন	**বর্ণে প্রয়োগ**	**বানানে প্রয়োগ**
উ	পু	পুণ্য
	রু	গরু
	শু	পশু
	হু	বহু

অধ্যাপক সরকার অবশ্য মনে করেন, 'বানান-সমস্যার সঙ্গে Allograph-এর সংখ্যাধিক্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, যদিও এ ঘটনাটি শিশুর বর্ণপরিচয় প্রক্রিয়াকে কঠিন করে তোলে।'

বর্ণ-ধ্বনি-উচ্চারণ-বর্ণরূপের অসংগতি থেকে তৈরি যে পাঁচরকম সমস্যার উল্লেখ করা হল, তার সমাধান-সূত্রও খুঁজে দেখা যাক পবিত্রবাবুর ভাবনাচিন্তার পথ ধরেই। একটু আগেই দেখলেন, ঐ পাঁচটি সমস্যার মধ্যে প্রথম চারটি বর্ণমালার উপাদানের সমস্যা, শেষেরটি বর্ণচিহ্নের রূপভেদের সমস্যা। এও জানলেন, বর্ণমালার উপাদানের সঙ্গেই বানান-সমস্যার সরাসরি সম্পর্ক। সেই কারণে, সেই উপাদানের সংস্কারই হবে বানান-সমস্যার সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি কাজ। 'উপাদানের সংস্কার'—এর অর্থ, ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের সম্পর্কে যেসব অসংগতি পাওয়া গেল সেগুলিকে হয় দূর করে, না-হয় কমিয়ে এনে মান্য চলিত বাংলার ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের মধ্যে সরাসরি সহজ সম্পর্ক তৈরি করা। অর্থাৎ আমাদের কাজ হবে ধ্বনি আর বর্ণের অনুপাতকে যথাসম্ভব ১:১ ('এক ধ্বনি, একটি প্রতীক') বা তার কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া।

তাহলে, একটি ধ্বনির জন্য একটি বর্ণকে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করে দেওয়াই হবে বানান-সমস্যার সমাধানের অন্যতম পথ। এর জন্য আবশ্যক, যেসব বাংলা শব্দে এখনও পর্যন্ত বিকল্প বানানের সংস্থান রয়েছে, তা থেকে কেবল একটি করে বানান বেছে নেওয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লোপ করার বিধান দিয়ে সেপথে খানিকটা এগিয়েছিলও। কিন্তু তবু যেসব বিকল্প বানানের সমস্যা আজও পর্যন্ত থেকে গিয়েছে, তার চেহারাটা এইরকম—

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ঃ (১) ি-ী—অঙ্গুলি-অঙ্গুলী, কুটির-কুটীর, ভঙ্গি-ভঙ্গী।

(২) উ-ঊ—উর্ণা-ঊর্ণা, উর্ণনাভ-ঊর্ণনাভ।

(৩) ু-ূ—চঞ্চু-চঞ্চূ, ভ্রু-ভ্রূ, ইন্দুর-ইন্দূর।

(৪) শ-ষ-স—কিশলয়-কিসলয়, উশীর-উষীর, শরণি-সরণি।

তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে ঃ (১) ি-ী—কুমির-কুমীর, পাখি-পাখী, বাড়ি-বাড়ী।

(২) উ-ঊ—উনিশ-ঊনিশ।

(৩) ু-ূ—চুন-চূন, পুব-পূব।

(৪) ঙ-ং—বাঙলা-বাংলা, রঙ-রং, সঙ-সং।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঃ শ-স—শহর-সহর, শয়তান-সয়তান, পুলিশ-পুলিস।

প্রতিটি জোড়াশব্দের দুটি বানানই অনুমোদিত। এই একাধিক বিকল্পের কোন্‌টিকে আমরা গ্রহণ করব, তৎসম-তদ্ভব-বিদেশি শব্দের বানানে এটা বড়ো সমস্যা। এরপাশে তদ্ভব আর অর্ধ-তৎসম শব্দের বানানের বিশেষ সমস্যা—'এদের বানান মূল সংস্কৃত বানানকে স্মরণ করবে কি করবে না, করলে কতটা এবং কোথায় করবে?' দেশি আর বিদেশি শব্দে, বিশেষ করে বিদেশি শব্দের বানানেও 'ব্যুৎপত্তি আর উচ্চারণের মধ্যে টেন্‌শন চলে।' হিশেব-হিসেব শাবান-সাবান শাদা-সাদা—কোন্‌ বানানটি লিখব, এই নিয়ে দ্বিধা, সংশয়।

তৎসম অর্ধতৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি—এই পাঁচ রকমের শব্দ নিয়ে তৈরি এমন বিচিত্র চরিত্র যে ভাষার শব্দভাণ্ডারের, তার বানান-নীতিও বিচিত্র হতে বাধ্য। অর্থাৎ 'কিছু শব্দের বানান এক নীতিতে হবে, কিছু শব্দের বানান হবে অন্য নীতিতে।' একথা মাথায় রেখে বাংলাভাষার বানান-সমস্যার সমাধান-সূত্র হিসেবে অধ্যাপক সরকারের সুপারিশ এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দের মূল বানান যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে। তবে মূল বানানের একাধিক বিকল্প থেকে একটিকে বেছে নিয়ে বাংলায় গ্রহণ করতে হবে।

(খ) অর্ধতৎসম আর তদ্ভব শব্দের বানানে কতটা তৎসম বানানের অনুসরণ থাকবে, আর কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে (অর্থাৎ উচ্চারণ মেনে চলবে)—তার স্থায়ী মীমাংসা করতে হবে।

(গ) দেশি-বিদেশি শব্দের বানান ধ্বনিসংবাদী করতে হবে।

(ঘ) বানান-পদ্ধতিকে সরল করার জন্য বর্ণমালার উপাদানের যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তা করতে হবে।

১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলাভাষাপ্রসঙ্গে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়েছিল। এ আলোচনাচক্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা বানান সংস্কার। বিষয়টি ঘিরে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, তা থেকে বানান-সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে কিছু কিছু টুকরো কথা পরপর সাজিয়ে দিই—

১. প্রবোধচন্দ্র সেন বললেন, 'আমরা যা করতে চাই তা হল বানানের uniformity বা সমতা। একই শব্দের নানা জনে বিভিন্ন ধরনের বানান লিখছেন। সেখানে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই।.....সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য রূপটিকেই সবার মানা উচিত।'

তিনি আরও বললেন, 'বানানের ক্ষেত্রে সমতা আনা যেমন খুব দরকার তেমনি সেই অনুযায়ী অভিধান লেখাও চাই।'

প্রবোধচন্দ্র সেনের কথা থেকে সহজেই আন্দাজ করতে পারবেন, **বাংলা-বানানের মূল সমস্যা সমতার অভাব**—'নানা জনে বিভিন্ন ধরনের বানান' লেখার প্রবণতা থেকেই সমস্যাটি তৈরি হয়েছে। এর সমাধান হতে পারে দুভাবে—এক, বানানের 'একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে'; দুই, বানানে সমতা এনে সেই অনুযায়ী একটি অভিধান লিখে।

২. অধ্যাপক রামেশ্বর শ' তিনরকম বানান-সমস্যার কথা জানালেন—

(ক) একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র বর্ণ দিয়ে লেখা। 'অ্যাকটা-অ্যাখন' শব্দের 'অ্যা' আর 'এরা- এসব' শব্দের 'এ' পৃথক দুটি ধ্বনি। অথচ, একটিমাত্র বর্ণ 'এ' দিয়েই ধ্বনিদুটিকে রূপায়িত করতে হয়।

(খ) একই ধ্বনিকে একাধিক বর্ণ দিয়ে লেখা। 'পণ' শব্দের 'ণ' আর 'মন' শব্দের 'ন' একই ধ্বনি। অথচ, একই ধ্বনির জন্য রয়েছে দুটি বর্ণ (ণ-ন)। বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের অনুসরণ চলছে বলেই এই সমস্যা।

(গ) অনেক সময় অন্যভাষার উচ্চারণকে ঠিক ঠিক লিখে ফেলার মতো বর্ণ বাংলায় পাওয়া যায় না। ইংরেজি J-র উচ্চারণ 'জ' দিয়ে লেখা যায়, কিন্তু Z-এর উচ্চারণ লেখার মতো বর্ণ বাংলায় নেই। এক ভাষার ধ্বনি অন্যভাষায় লিখতে গেলে এ সমস্যাটা এসে যায়।

এই তিনটি সমস্যার সমাধান হিসেবে অধ্যাপক শ'-র সুপারিশ, ভাষার প্রত্যেক ধ্বনিকে উপস্থাপিত করার জন্য একটিমাত্র স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্ন থাকবে। যেহেতু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা এই নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে ঐ বর্ণমালার মূল নীতিটি আমরা অনুসরণ করতে পারি, এবং আমাদের প্রচলিত বর্ণমালা থেকেই আবশ্যকমতো বর্ণ বাছাই করে নিতে পারি। এই বাছাই করতে গিয়ে কিছু বর্ণ বাদ যাবে (যেমন, ই-ঈ থেকে একটি উ-ঊ থেকে একটি, ঋ-র বদলে আসবে 'রি'), আবার দুটি একটি নতুন বর্ণ তৈরিও করতে হবে (যেমন 'আ'-র জন্য)। এমনি করে ধ্বনি অনুযায়ী বর্ণমালা তৈরি করে ধ্বনিভিত্তিক বানান-পদ্ধতি প্রচলন করলে তা হবে বানান-সমস্যা সমাধানের পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।

অধ্যাপক শ'র-মূল বক্তব্য এইরকম—'প্রত্যেক ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ অপরিহার্য, কোনো ধ্বনির জন্যে একের বেশি বর্ণ থাকবে না এবং বানান **লিখিত** হবে ধ্বনির উচ্চারণ অনুযায়ী—এই মূল তিনটি নীতি গৃহীত হলে বাংলা বানানের সব সমস্যার সমাধানে সঙ্গতি থাকবে।'

৩. বাংলা বানানে, বিশেষ করে শিশুপাঠ্য বই-এর বানানে সমতার অভাবটাই অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বড়ো সমস্যা বলে মনে হয়েছে। এর সমাধান-প্রয়াসে তাঁর দেওয়া প্রস্তাবগুলি এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দে মূল বানান অনুসৃত হবে। তবে সেইসঙ্গে মেনে নিতে হবে রেফ-যুক্ত-ব্যঞ্জনে দ্বিত্ববর্জন (ধর্ম কর্ম মূর্ছনা), হ্রস্ব-দীর্ঘের বিকল্প বিধান থেকে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান ('সূচী-সুচী' থেকে কেবল 'সূচি', তেমনি 'পল্লি' 'আবলি'), পূর্বপদের শেষে 'ম্' আর পরপদের শেষে 'ক-খ-গ-ঘ' এর সন্ধিতে 'ঙ'-র বদলে 'ং' (অহংকার, সংগীত), পদান্তে বিসর্গ লোপ (ক্রমশ, সাধারণত, ইতস্তত), হস্‌চিহ্ন বর্জন (দিক বিরাট শ্রীমান আশিস)।

(খ) তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান, দীর্ঘত্ব থাকবে না (বাড়ি গরিব শাশুড়ি পুর পুজো), য-জ থেকে কেবল জ থাকবে (কাজ জাদু), ণ-ন থেকে কেবল ন থাকবে (রানি দরুন অঘ্রান), ক্ষ-খ থেকে কেবল খ থাকবে (খেত খ্যাপা খুদিরাম), চন্দ্রবিন্দু থাকবে না (ইট কাচ), ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা (হালকা আলপনা), ঙ্গ-র বদলে ঙ (ভাঙা রঙিন ঠোঙা), ঐ-ঔ এর বদলে অই-অউ থাকবে (হইচই বউ)।

(গ) শ ষ স র ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বানান-রীতি। তদ্ভব-অর্ধতৎসম-দেশি শব্দে প্রচলিত বানান (মশা পিসি মিনসে শাঁস), বিদেশি শব্দে যথাসম্ভব মুলানুগ বানান (শহর মুশকিল)।

(ঘ) নতুন বর্ণ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত 'অ্যা'-দিয়ে লেখা (অ্যাসিড ল্যাজ ঢ্যাঙা)।

(ঙ) ও-কার আর ঊর্ধ্বকমার বাহুল্যবর্জন (কলকাতা)। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কেবল ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা আর অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঊর্ধ্বকমা (ক'রো ব'লো ক'রে ব'লে) এবং নামধাতুর বেলায় ও-কার চলবে।

(চ) স্বরসংগতি আর অভিশ্রুতির ফলে তৈরি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান মেনে নেওয়া যেতে পারে (ওপর ভেতর হিসেব নৌকো সুতো)।

৪. অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির সমস্যা লক্ষ করে এর সমাধানের পথ খোঁজেন এইভাবে—'যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না আনা।' অধ্যাপক গুপ্ত-র সুপারিশ এইরকম—

(ক) বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা অনায়াসে কমিয়ে আনা যায় ৬য়ে—অ আ ই উ এ ও।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাও বেশ কমিয়ে আনা সম্ভব। বাদ যেতে পারে ঙ ঞ ণ, শ ষ, অন্তস্থ-ব, ঃ।

(গ) য-কে জ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ফলা হিসেবে রাখতে হয়।

(ঘ) যুক্তব্যঞ্জনের যেগুলির উচ্চারণ বাংলায় নেই সেগুলি ত্যাগ করাই উচিত (ক্ষ = ক্‌খ = খ্‌খ)। 'ত্ন' 'ণ্ড'-র মতো যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দেওয়া যায় ('যত্ন'-র বদলে 'যত্‌ন', 'লণ্ডন'-এর বদলে 'লন্‌ডন')।

৫. বাংলা বানানের সমস্যার ভাবনায় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য এইরকম—'বাঙ্‌লা বানানের সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ, ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান বিভ্রান্তিকর হচ্ছে, চোখে হোঁচট খেতে হচ্ছে, আর শিশুদের ভাষাশিক্ষার বিভ্রাট ঘটছে।.....বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যা-খুশি-তাই এর অনাচার এমনিই প্রবল হয়েছে যে আজ ভাবতে হচ্ছে বানান নিয়ে কী করা যায়।.....১৯৩৭-এর বানান সংস্কার সমিতির অনুমোদনে বহু বিকল্প রাখা হয়েছিল....বিকল্প বিধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বইয়ে তো বটেই, এমনকি এক বইয়ের মধ্যেও একই শব্দের দুরকম বানান দেখা যায়।

.....একই বানানের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব—করছি-করচি-কোরছি, হল-হোল-হলো, গেল-গেলো প্রভৃতি তো চলা ঠিক নয়। সুতরাং একটা নীতি স্থির করে নিয়ে বই-লেখক এবং সাংবাদপাত্রিকদের বলে দেওয়া যে এর অন্যথা চলবে না।'

সঠিক নীতি স্থির করে তা মান্য করে তোলার এই আহ্বান থেকে অধ্যাপক দাসের দেওয়া সমাধান-সূত্রগুলি এইভাবে বেরিয়ে আসে—

(ক) সংস্কৃত শব্দের বানান যথেচ্ছভাবে বদলানো যাবে না।

(খ) যেসব বানান প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা জোর করে বদলানো যাবে না।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির দেওয়া বিকল্পের অবকাশ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

(ঘ) কলকাতার অঞ্চলবিশেষে যে-রীতির উচ্চারণসহ বানান ছাপার অক্ষরে বের হচ্ছে, তা সারা বাংলায় চালানো যাবে না।

(ঙ) উচ্চারণ-অনুযায়ী সব বানান-এর স্লোগান কার্যকর করা যাবে না।

এছাড়া, এ সমস্যার সমাধান-সূত্র হিসেবে দুটি-একটি লিপি-সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন—যেমন 'এ্যা' চিহ্নকে স্বরবর্ণের তালিকায় যুক্ত করা, ই-কারের দাঁড়িটা বাদ দেওয়া, ং-চিহ্নকে বাদ দেওয়া ইত্যাদি।

১৯২৫ থেকে ১৯৮৫ —এই ষাট বছরে বাংলা বানানের নানা সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে যে-ধরনের ভাবনাচিন্তা হয়েছে, তার খানিকটা আন্দাজ অবশ্যই করলেন। সেইসঙ্গে এসব ভাবনাচিন্তার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য দেখছেন, তেমনি একই ধরনের ভাবনা বার বার নানাজনের বক্তব্যে ঘুরে ফিরে আসতেও দেখছেন। তবে যেসব সমস্যা একালের লেখালেখিতে অত্যন্ত প্রকট এবং খানিকটা উৎকট, তাদের চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমাধান-সূত্র তৈরি করে দিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। আকাদেমির 'বানানবিধি' যেকটি সমস্যা সংকলন করল, তা এইরকম —

তৎসম শব্দ ঃ
১. হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন, বিশেষত ই-ঈ, উ-ঊ
২. বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের রক্ষা/বর্জন
৩. হস্‌চিহ্নের সমস্যা
৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব
৫. ঙ আর ং
৬. শ ষ স

অ-তৎসম শব্দ ঃ
১. হ্রস্ব-ই কার দীর্ঘ ঈ-কারের সমস্যা
২. কি আর কী
৩. হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার নিয়ে
৪. শব্দান্তে ও-কার
৫. ঙ বনাম ঙ্গ
৬. জ এবং য
৭. ণ এবং ন
৮. য-ফলা
৯. শ ষ স

১০. ক্ষ এবং খ

১১. নি আর নে

বিদেশি শব্দ ঃ ১. শ স

(বিশেষ সমস্যা) ২. র-ফলা

৩. ব্যঞ্জনপূর্ব র্-রেফ

এই কুড়িটি সমস্যার সমাধান করতে কুড়িটি নিয়ম তৈরি করে দিল বাংলা আকাদেমি, এবং এইসব নিয়মনীতি যাঁরা 'জানতে এবং মানতে চান, তাঁদের হাতে সেটা পৌঁছে দিতে এবং সেই নিয়মের চেয়ে বানানটাই তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরতে আকাদেমি বের করল প্রায় ৪৩,০০০ শব্দ-বানানের একটি সংকলন—আকাদেমি বানান অভিধান (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১)।

১১৩.৫.১ সারাংশ—৩

১৯৮২ থেকে ২০০১ সময়ের মধ্যে বাংলা বানানের সমস্যা আর সমাধান নিয়ে যেসব ভাবনা-চিন্তা আর কাজ হয়েছে, তার মূলত তিনটে ভাগ। প্রথম ভাগে (১৯৮২ থেকে ১৯৮৫) অধ্যাপক পবিত্র সরকারের লেখা কিছু প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে (১৯৮৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলা-বানান-সংস্কার বিষয়টি নিয়ে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্র, তৃতীয়ভাগে (১৯৯৭ থেকে ২০০১) বাংলা আকাদেমির কুড়ি দফা বানানবিধি আর 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর পরপর তিনটি সংস্করণের প্রকাশ।

প্রথম ভাগ (১৯৮২-১৯৮৫) ঃ অধ্যাপক পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ

অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, বাংলা বর্ণমালা আর বানান-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতি পাঁচ রকমের এবং তা থেকে তৈরি বানান-সমস্যাও পাঁচরকমের—

(১) ধ্বনি আছে, বর্ণ নেই (অ্যা)।

(২) ধ্বনি একটি, প্রতীক বা বর্ণ একের বেশি (ই-ঈ ণ-ন শ-ষ-স)।

(৩) বর্ণ একটি, উচ্চারণ একইসঙ্গে একাধিক ধ্বনির (ঐ = ও-ই, ঔ = ও-উ)

(৪) বর্ণ একটি, উচ্চারণ পৃথক ক্ষেত্রে পৃথক রকমের (অ-বর্ণের উচ্চারণে 'অজয়' শব্দে 'অ', 'অরুণ' শব্দে 'ও')

(৫) ধ্বনি একটি, রূপ একের বেশি (উ-ধ্বনির নানরকম রূপ—হু = হ্ + উ, কু = ক্ + উ, শু = শ + উ, রু = র্ + উ)

প্রথম চারটি সমস্যা বর্ণমালার উপাদানের, শেষেরটি রূপের। বানান-সমস্যার সঙ্গে-উপাদানের সমস্যার সরাসরি সম্পর্ক। অতএব বানান-সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে জরুরি কাজ বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, অর্থাৎ ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের অসংগতি দূর করে বা কমিয়ে এনে এদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক তৈরি করা। এটা করা সম্ভব একটি ধ্বনির জন্য একটিমাত্র বর্ণকে নির্দিষ্ট করে, বিকল্প বানান থেকে একটিমাত্র বানান বেছে নিয়ে। কিন্তু, বিকল্প বানান থেকে একটিকে বাছাই করার সমস্যা উৎস-কে মানব না উচ্চারণকে মানব এই নিয়ে। বাংলা শব্দভাণ্ডার তৎসম-অর্ধতৎসম- তদ্ভব-দেশি-বিদেশি এই পাঁচরকম শব্দে তৈরি বলে বাংলা শব্দের বানানও তৈরি হবে একাধিক নীতিতে।

অতএব, বানান-সমস্যার সমাধান-সূত্র হতে পারে এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রাখা, মূল বানানের একাধিক বিকল্প থেকে একটি বানান বেছে নেওয়া।

(খ) অর্ধতৎসম আর তদ্ভব বানান কতটা তৎসম বানানকে অনুসরণ করবে, আর কতটা উচ্চারণ মেনে চলবে, তার মীমাংসা করা।

(গ) দেশি আর বিদেশি শব্দের বানানকে উচ্চারণ-অনুসারী করা।

(ঘ) বানান-পদ্ধতিকে সরল করার জন্য বর্ণমালার উপাদানের আবশ্যক সংস্কার করা।

দ্বিতীয় ভাগ (১৯৮৫) ঃ বাংলা-বানান-সংস্কার বিষয়ে আলোচনা-চক্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচজন বক্তার বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। প্রতিটি বক্তব্যেই থাকছে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের সূত্র।

১. প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য, বাংলা বানানের মূল সমস্যা সমতার অভাব—একই শব্দের নানারকম লেখার প্রবণতা। এর সমাধান, বানানকে নির্দিষ্ট নিয়মে বেঁধে দেওয়া আর সেই অনুযায়ী একটি অভিধান তৈরি করা।

২. অধ্যাপক রামেশ্বর শ'-র মতে বাংলায় বানান-সমস্যা তিনরকম—

(ক) একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র বর্ণ দিয়ে লেখা (**একটা-এরা**)।

(খ) একই ধ্বনিকে একাধিক বর্ণ দিয়ে লেখা (**পণ-মন**)।

(গ) অন্যভাষার উচ্চারণ লেখার জন্য আবশ্যক বাংলা বর্ণের অভাব (Z)।

এর সমাধান করতে গেলে কিছু বর্ণ বাদ যাবে (যেমন, ই-ঈ থেকে একটি), দুটি-একটি নতুন বর্ণ তৈরি হবে (যেমন, 'অ্যা'-র জন্য)। এমনি করে প্রতিটি ধ্বনির জন্য থাকবে একটিমাত্র বর্ণ আর বানান লেখা হবে উচ্চারণ মেনে।

৩. শিশুপাঠ্য বই-এর বানানে সমতার অভাব অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের মতে বাংলা বানানের বড়ো সমস্যা। এর সমাধানে তিনি এমন কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করলেন (তৎসম বানানে রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব না-দেওয়া, হ্রস্ব-দীর্ঘ বিকল্প থেকে হ্রস্বযুক্ত বানান বেছে নেওয়া, তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান, য-ণ-ক্ষ-চন্দ্রবিন্দুর উচ্ছেদ, ঙ্গ-র বদলে ঙ আর ঐ-ঔ-এর বদলে অই-অউ লেখা, আপাতত 'অ্যা' দিয়ে লেখা, ও-কার আর ঊর্ধ্বকমার বাহুল্যবর্জন ইত্যাদি), যার ফলে প্রতিটি শব্দের বানান যথাসম্ভব নির্দিষ্ট হতে পারে।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির সমস্যা লক্ষ করলেন বাংলা বানানে। তাঁর মতে, এর সমাধানের পথ বানানকে যথাসম্ভব উচ্চারণ-মুখী করা আর প্রচলিত সরল বানানকে যথাসাধ্য বজায় রাখা। এর জন্য আবশ্যক বর্ণ-সংখ্যা সম্ভবমতো কমিয়ে আনা আর দুটি-একটি যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে দেওয়া (ত্ন = ত্‌ন, ন্ড = ন্‌ড)।

৫. অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য, বাংলা বানানের সমস্যা হল ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান। বিকল্প বানানের বিধান থাকার কারণে ভিন্ন ভিন্ন বই-য়ে, এমনকী একই বই-য়েও একই শব্দের দু-রকম বানান বিভ্রান্তিকর, শিশুশিক্ষার পক্ষেও ক্ষতিকর। এর সমাধান হিসেবে তাঁর সুপারিশ, বানানের একটা সঠিক নীতি স্থির করে লেখক-সাংবাদিকদের তা মানতে বাধ্য করা। সমাধান-সূত্রগুলি এইরকম হতে পারে—সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রচলিত শব্দের বানান খুশিমতো না বদলানো, বিকল্প বানান কমিয়ে আনা, উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান কার্যকর না করা। এ ছাড়া, দুটি-একটি লিপি সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি রেখেছেন ('এ্যা' চিহ্নকে স্বরবর্ণের তালিকায় আনা, ং-চিহ্নের উচ্ছেদ ইত্যাদি)।

তৃতীয় ভাগ (১৯৯৭-২০০১) ঃ বানানবিধি আর বানান অভিধান

প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগে বানানের যেসব সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র বানান-ভাবুকদের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এল, তাদের চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমাধান-সূত্র তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারকে তৎসম আর অ-তৎসম ভাগে ভাগ করে কুড়িটি সমস্যা নির্দিষ্ট করা হল। তার সমাধানের জন্য কুড়িটি নিয়ম তৈরি করে বের করা হল কুড়ি দফার 'বানানবিধি'। আর সেই কুড়িটি নিয়মে বেঁধে

দেওয়া বানান আগ্রহী এবং জিজ্ঞাসু মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্য সংকলিত হল ৪৩ হাজার শব্দ-বানান, বেরিয়ে এল 'আকাদেমি বানান অভিধান' (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭ সালে, তৃতীয় সংস্করণ ২০০১ সালে)।

১১৩.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. বাংলা বানানের সমস্যা আর সমাধান প্রসঙ্গে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের চিন্তা-ভাবনা আর সুপারিশ সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২. বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন-ক্ষেত্র গুপ্ত-ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য সংকলন করুন।

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২-দফা 'বাংলা বানানের নিয়ম' থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ২০-দফা 'বানানবিধি'-তে পৌঁছতে কোন্ কোন্ বিধিনিয়মের বর্জন সংযোজন সংশোধন ঘটল, উদাহরণসহ সেসব উল্লেখ করুন।

১১৩.৬ সহায়ক পাঠ

একক ২-এর তিনভাগে ভাগ-করা মূলপাঠের বক্তব্য বুঝতে সহায়তা করবে এই পাঁচটি বই-এর অন্তর্গত কয়েকটি বিষয়—

১. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত 'বানান বিতর্ক' (বানান-সমস্যা নিয়ে লেখা আলোচনাগুলি) ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

২. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা' (প্রবোধচন্দ্র সেন-ভূদেব চৌধুরী-ক্ষেত্র গুপ্ত-রামেশ্বর শ'-ক্ষুদিরাম দাস-অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আলোচনাগুলি) ঃ

৩. পবিত্র সরকারের লেখা 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' (পৃ. ৫৪-৯৯ আর ১৬২-৬৯) ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯২।

৪. মণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা 'বাংলা বানান' 'বাংলা বানান-সমস্যা', 'বানান-সমস্যা' অধ্যায়-দুটি ঃ দে'জ তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০।

৫. আকাদেমি বানান অভিধানের 'পরিশিষ্ট-১' থেকে ২০-দফা 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি' ঃ তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০১।

একক ১১৪ ❑ বাংলা বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ

গঠন

১১৪.১ উদ্দেশ্য

১১৪.২ প্রস্তাবনা

১১৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ বাংলা বর্ণমালার প্রয়োগে বিবর্তন

১১৪.৩.১ সারাংশ-১

১১৪.৩.২ অনুশীলনী-২

১১৪.৪ মূলপাঠ-২ ঃ বাংলা বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্ক

১১৪.৪.১ সারাংশ-২

১১৪.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৪.৫ সহায়ক পাঠ

১১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে ধ্বনি-উচ্চারণের সঙ্গে আপনার চেনা বাংলা বর্ণমালার সম্পর্কটি ঠিক কী ধরনের, সে বিষয়ে আপনি আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারবেন। উপলব্ধি করবেন—বর্ণ-ধ্বনির সম্পর্কের মাঝখানে ফাঁক কোথায়, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কী ভাবছেন, প্রতিকারের উপায় কী। এই কৌতূহল আর উপলব্ধি আপনাকে উত্তীর্ণ করবে বাংলা বানান-সমস্যার মূল কারণটি খুঁজে নেবার দায়িত্বে।

১১৪.২ প্রস্তাবনা

একক-২-এ বাংলা বানানের যেসব সমস্যার উল্লেখ করা হল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বাংলা বর্ণমালার উপাদানের সমস্যা। একে বলতে পারি বর্ণ আর ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা, অর্থাৎ বর্ণ আর ধ্বনির সম্পর্কের সমস্যা। বর্ণের বিন্যাসই যখন বানান, তখন বর্ণ-ধ্বনির যথাযথ সম্পর্কেই

গড়ে উঠবে শব্দের সঠিক বানান। যেখানে এই সম্পর্কে ফাঁক থাকবে, সেখানেই তৈরি হবে বানান-সমস্যা। আর, বাংলা বানানের মূল সমস্যা যখন বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে ধ্বনি-উচ্চারণের অসংগতিরই সমস্যা, তখন দেখা যাক, বর্ণমালা আর ধ্বনি-উচ্চারণের সঠিক সম্পর্কটা কী হতে পারত এবং এই মুহূর্তে সম্পর্কটা কোন্ অবস্থানে রয়েছে। চলতি এককের মূলপাঠটিতে এটাই হবে আমাদের বিবেচনার বিষয়।

১১৪.৩ মূলপাঠ-১ ঃ বাংলা বর্ণমালার প্রয়োগে বিবর্তন

প্রথমে শুনুন বাংলা বর্ণমালার কথা। দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত বাংলা লেখায় যেসব বর্ণের প্রয়োগ চলে আসছিল, ১৮৩৩-এ তাকেই তালিকাবদ্ধ করলেন রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ। ১৮৫৫ সালে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে'-র প্রথম সংস্করণে এবং তার কুড়ি বছর পরে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে'-র ষষ্টিতম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা উচ্চারণের কথা মাথায় রেখে একটি নতুন বর্ণমালা বাঙালি শিশুদের জন্য তৈরি করে দিলেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বর্ণমালার সংস্কার নিয়ে কিছু কিছু বিতর্ক উঠলেও, ১৯৩৬-এর 'বাংলা বানানের নিয়ম' আর ১৯৯৭-এর বাংলা আকাদেমির 'বানানবিধি' পেরিয়ে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর বর্ণমালা এখনও পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত, বদলেছে সামান্যই। নীচের অঙ্কগুলি লক্ষ করুন, তা থেকে বর্ণ-বদল খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন—

সাল	বই	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট বর্ণ-সংখ্যা
১৮৩৩	গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৬	৩৪	৫০
১৮৫৫	বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ (প্রথম সংস্করণ)	১২	৩৯	৫১
১৮৭৫	ঐ (ষষ্টিতম সংস্করণ)	১২	৪০	৫২
১৯৫২	চলন্তিকা	১১ (+১)	৩৯	৫০ (+১)
২০০১	আকাদেমি বানান অভিধান (৩য় সংস্করণ)	১১ (+১)	৩৯	৫০ (+১)

এবারে দেখুন কোন্ বই-য়ে কী ধরনের বর্ণমালার নির্ধারণ হয়ে অবশেষে একুশ শতকের গোড়ায় কোন্ বর্ণমালা আমাদের হাতে পৌঁছেছে—

১. **রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)**

অ	আ	ই	ঈ			
উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	
এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ	স্বরবর্ণ = ১৬
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ		
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		
ত	থ	দ	ধ	ন		
প	ফ	ব*	ভ	ম		* বর্গীয় ব
য	র	ল	ব**	শ		** অন্তঃস্থ ব
ষ	স	হ	ক্ষ			ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৪
						মোট বর্ণসংখ্যা = ৫০

২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ' (১৮৫৫, ১৮৭৫)**

অ	আ	ই	ঈ		
উ	ঊ	ঋ	ঌ		
এ	ঐ	ও	ঔ		স্বরবর্ণ = ১২
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	

প	ফ	ব*	ভ	ম	* বর্গীয় ব
য	র	ল	ব**	শ	** অন্তঃস্থ ব
ষ	স	হ	ড়	ঢ়	*** ১৮৫৫-র প্রথম সংস্করণে ছিল না।
য়	ং	ঃ	ঁ	ৎ***	ব্যাঞ্জনবর্ণ = ৪০

মোট বর্ণসংখ্যা = ৫২

৩. **রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৯৫২)/পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান' (৩য় সং-২০০১)**

অ (+অ্যা)	আ	ই	ঈ		+ প্রকাশ্যে বর্ণ নয়, অথচ স্বতন্ত্র প্রয়োগ
উ	ঊ	ঋ			
এ	ঐ	ও	ঔ		স্বরবর্ণ = ১১ (+১)
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল	শ		
ষ	স	হ	ড়	ঢ়	
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ	ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৯

মোট বর্ণসংখ্যা ৫০ = (+১)

পুরোনো বাংলার ৫০টি বর্ণকে অবিকল রেখেই রামমোহন যখন তালিকাবদ্ধ করলেন, তখন বদলে-যাওয়া উচ্চারণের কথা তিনি ভাবেন নি। তবে তিনি লক্ষ করেছিলেন—'ণ য ব ষ ঋ ৠ ঌ ঐ অং অঃ—এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।' এর পর বিদ্যাসাগর যখন ঐ ৫০টি বর্ণে কিছু বর্জন স্থানান্তরণ সংযোজন করে ৫২টি বর্ণ সাজালেন, তখন বাঙালির উচ্চারণের

কথা মাথায় রেখেই তিনি সেসব করলেন। ১৮৫৫ আর ১৮৭৫ এর 'বর্ণপরিচয়—প্রথমভাগে'র বিজ্ঞাপন দুটির অংশবিশেষ পড়ে দেখুন—

প্রথম সংস্করণ (এপ্রিল ১৮৫৫) ঃ

'বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়;.....যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত;....ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

ষষ্ঠিতম সংস্করণ (ডিসেম্বর ১৮৭৫) ঃ

'বাঙ্গালা ভাষায় ত-কারের ত, ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড ত-কার। ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড ত-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।'

এবার লক্ষ করুন, উপরের তিনটি বর্ণমালায় বর্ণ-বদল কীভাবে কতটুকু ঘটেছে গত ১৭০ বছরে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'-র যে ৫০টি বর্ণ (স্বরবর্ণ ১৬টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি) বিদ্যাসাগরের হাতে এল, বিদ্যাসাগর তা থেকে বর্জন করলেন ২টি স্বরবর্ণ (ঋ, ঌ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক্ষ), ব্যঞ্জন-তালিকায় স্থানান্তর করলেন ২টি স্বরবর্ণ (অং, অঃ), আর ১৮৫৫ সালে সংযোগ করলেন ৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ড়, ঢ়, য়, ঁ), ১৮৭৫ সালে আরও একটি বর্ণ (ৎ)। এর ফলে 'বর্ণপরিচয়ের' বর্ণসংখ্যা হল ৫২ (স্বরবর্ণ ১২টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি)।

রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধান ১৯৫২ সালের সংস্করণে বিদ্যাসাগরী বর্ণমালার অর্ন্তগত ২টি বর্ণকে ছাঁটাই করেছে—স্বরবর্ণ 'ঌ' আর ব্যঞ্জনবর্ণ 'অন্তঃস্থ ব'। সেই সঙ্গে স্বরবর্ণ-তালিকার সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত করেছে আর-একটি বর্ণ—'অ্যা'। ১৯৯৭-তে বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান' 'চলন্তিকা'-র বর্ণ-প্রয়োগকেই অনুসরণ করেছে। তবে 'অ্যা'-কে স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হিসেবে গণ্য করা আর 'অন্তঃস্থ ব' কে বাংলা বর্ণমালা থেকে বহিষ্কার করা নিয়ে একটা দ্বিধা থাকছেই 'চলন্তিকা'য় আর 'আকাদেমি বানান অভিধানে'। 'অ্যা একটি স্বতন্ত্র স্বর'—'ভূমিকায় একথা মেনে নিয়েও 'চলন্তিকা'-কার অ্যা-বর্ণটিকে অ-বর্ণের অর্ন্তগত করে দেখিয়েছেন (অ + ্য + া)। ১৯৯৭-এর প্রথম সংস্করণে 'আকাদেমি বানান অভিধান' অ্যা-কে প্রকাশ্যে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিল 'অ' আর 'আ' র

মাঝখানে রেখে। কিন্তু ১৯৯৮-এর দ্বিতীয় সংস্করণে 'অ্যা' সে মর্যাদা হারিয়ে অ-বর্ণের অর্ন্তগত হল। 'অন্তস্থ ব' দুটি অভিধান থেকেই বাদ পড়েছে, কিন্তু অভিধান-রচয়িতাদের ভাবনা থেকে বাদ পড়ে নি। তাই, দুটি অভিধানেই 'বর্গীয় ব' আর 'অন্তস্থ ব'-কে একই সঙ্গে প-বর্গের অর্ন্তগত বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অবশেষে 'চলন্তিকা' আর 'বানান অভিধানে' বর্ণসংখ্যা দাঁড়াল ৫০ ('অ্যা'-কে ধরে ৫১)—এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি ('অ্যা'-কে ধরে ১২টি) আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

১১৪.৩.১ সারাংশ-১

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ মোট ৫০টি বাংলা বর্ণের তালিকা তৈরি করেছিলেন (স্বরবর্ণ ১৬টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি)। দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত যা-কিছু লেখা, তাতে ঐ ৫০টি বর্ণেরই প্রয়োগ ছিল। ১৮৫৫ সালে 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে'-র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ ৫০টি বর্ণ থেকে বাদ দিলেন ২টি স্বরবর্ণ (ঋ, ঌ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক্ষ), ব্যঞ্জন-তালিকায় সরিয়ে দিলেন ২টি স্বরবর্ণ (অং, অঃ), যোগ করলেন ৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ড়, ঢ়, য়, ঁ)। ১৮৭৫ সালের সংস্করণ যুক্ত হল আরও ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ৎ)। অতএব, বর্ণপরিচয়ের বর্ণ-সংখ্যা দাঁড়াল ৫২ (স্বরবর্ণ ১২টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি)। ১৯৫২ সালের 'চলন্তিকা' অভিধানে রাজশেখর বসু ১টি স্বরবর্ণ (ঌ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (অন্তঃস্থ ব) ছাঁটাই করলেন, আর পরোক্ষে যুক্ত করলেন ১টি স্বরবর্ণ (অ্যা)। এবারে বর্ণ-সংখ্যা আবার নেমে এল ৫১-তে (স্বরবর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। ১৯৯৭-র 'আকাদেমি বানান অভিধান' চলন্তিকা-কেই' অনুসরণ করল। তবে ১৯৯৮ দ্বিতীয় আর ২০০১-এর ৩য় সংস্করণে 'অ্যা' পৃথক বর্ণের মর্যাদা হারিয়ে 'অ'-র অর্ন্তগত হল। বর্ণসংখ্যা আবার নেমে এল ৫০-এ (স্বরবর্ণ ১১টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। 'অ্যা'-কে ধরে অবশ্য স্বরবর্ণ ১২টি, বর্ণ-সংখ্যা ৫১।

১১৪.৩.২ অনুশীলনী-১

১. ১৮৩৩ থেকে ২০০১—এই সময়ের মধ্যে বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, বুঝিয়ে দিন।

২. রামমোহন রায়ের পরিকল্পিত বাংলা বর্ণমালার ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কীভাবে এবং কী কী কারণে সংশোধন করলেন, দেখিয়ে দিন।

৩.(ক) রামমোহন রায়ের তৈরি বাংলা বর্ণমালা থেকে কোন্ কোন্ বর্ণ এ যাবৎ বর্জন করা হয়েছে, কারণসহ উল্লেখ করুন।

(খ) রামমোহন রায়ের তৈরি বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরবর্তীকালে কোন্ কোন্ বর্ণ সংযোজিত হয়েছে, কারণসহ উল্লেখ করুন।

১১৪.৪ মূলপাঠ—২ ঃ বাংলা বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্ক

'বর্ণপরিচয়'-এর বর্ণমালায় খণ্ড ৎ-সংযোগের (১৮৭৫) পর এক-শ বছরের বেশি সময় কেটে গেছে। বর্ণ আর উচ্চারণের সম্পর্ককে সহজ করার কথা নানাজনে নানাভাবে ভেবেছেন, এখনও ভাবছেন। তবু এ বিষয়ে অগ্রগতি সামান্যই ঘটেছে, বর্ণমালা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কেবল প্রয়োগহীন '৯' আর উচ্চারণহীন 'অন্তস্থ ব'-এর। 'সহজ সম্পর্ক' বলতে আমরা বুঝব একটি বর্ণের একটিই নির্দিষ্ট উচ্চারণ। অথবা বিপরীত দিক থেকে বুঝব, একটি ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ বা প্রতীক-চিহ্নের প্রয়োগ। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' আর বাংলা আকাদেমির 'বানান অভিধান' যে সর্বশেষ বর্ণমালার নির্দেশ দিচ্ছে, তাকে আশ্রয় করেই দেখা যাক, বর্ণ আর উচ্চারণের চলতি সম্পর্কটি কী ধরনের—

বর্ণ	উচ্চারণ	সম্পর্ক
অ	অ (অমন), ও (অমনি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
আ	আ (গোন), অ্যা (জ্ঞান)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
ই, ঈ	ই (যদি, নদী)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
উ, ঊ	উ (মধু, বধূ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঋ	রি (ঋতু = রিতু)	স্বরবর্ণের ব্যঞ্জন উচ্চারণ
x	অ্যা (অ্যাসিড)	উচ্চারণ আছে, বর্ণ নেই।
এ	অ্যা (এক), এ (একটি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ।
ঐ	ও-ই	১টি বর্ণে ২টি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ।

বর্ণ	উচ্চারণ	সম্পর্ক
ও	ও	১টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঔ	ও-উ্	১টি বর্ণে ২টি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ
ক, খ, গ, ঘ	ক, খ, গ, ঘ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ।
ঙ, ং	ঙ (অঙ্ক, শংকর)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
চ, ছ	চ, ছ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
জ, য	জ (জখম, যখন)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঝ	ঝ	১টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঞ, ণ, ন	ন (রঞ্জিত, রণিত, রন্ধন)	৩টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ট, ঠ, ড, ঢ	ট, ঠ, ড, ঢ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
ত, ৎ	ত (ঝনাত, ঝনাৎ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
থ, দ, ধ	থ, দ, ধ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
প, ফ, ব, ভ, ম	প, ফ, ব, ভ, ম	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
র, ল	র, ল	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
শ, ষ	শ (পোশাক, পোষা)	২টি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
স	স, শ (বস্তি, বসতি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
হ, ঃ	হ (বাদশাহ, বাঃ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ড়, ঢ়, য়, ঁ	ড়, ঢ়, য়, ঁ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ

চলতি বর্ণমালার অর্ন্তগত ৫০টি বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের সম্পর্ক যেভাবে দেখানো হল, তা থেকে এই কটি তথ্য আপনি পাবেন—

১. বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক (একটি বর্ণের একটিই উচ্চারণ) তৈরি আছে ২৬টি বর্ণের ক্ষেত্রে (ও, ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি)।

২. বর্ণ-উচ্চারণে সহজ সম্পর্ক নেই বাকি যে ২৪টি (বা 'অ্যা' ধরে ২৫টি) ক্ষেত্রে, তার বিভাজন এইরকম ঃ

(ক) একাধিক (২টি বা ৩টি) বর্ণের একই উচ্চারণ = ১৭টি বর্ণের ক্ষেত্রে (ই-ঈ, উ-ঊ, ঙ-ং, জ-য, ত-ৎ, শ-ষ, হ-ঃ, ঞ-ণ-ন)।

(খ) একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ (অ, আ, এ, স) = ৪টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(গ) একটি বর্ণে দুটি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ (ঐ, ঔ) = ২টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(ঘ) স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ (ঋ) = ১টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(ঙ) ধ্বনির উচ্চারণ আছে অথচ স্বতন্ত্র বর্ণ নেই, এমন ক্ষেত্রও ১টি রয়েছে (অ্যা)।

এখানে খেয়াল করতে হবে, স্বরচিহ্ন (া ি ী ু ূ ৃ .....), যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জনচিহ্ন (্ .....) এখনও পর্যন্ত আমাদের বিবেচনার বাইরে।

২-নং তথ্য থেকে বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির যে ক্ষেত্রগুলি বেরিয়ে এল, বাংলা বানান-সমস্যার মূলে সেগুলি কাজ করে চলেছে আজও পর্যন্ত। আর, এই অসংগতি বা অসাম্য ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে শতাধিক বছর ধরে। এর কারণ, বাংলা বর্ণমালার গোটাটাই সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে নেওয়া, সংস্কৃত বর্ণমালার আদলেই তৈরি। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশ তৎসম শব্দ এবং এসব শব্দের বানানের পুরো দায় এই বর্ণমালা এখনও বহন করে চলছে। অথচ সংস্কৃতের অনেক ধ্বনি আর তার উচ্চারণ বাংলায় এখন নেই। আসলে বাংলার বর্ণমালা সংস্কৃতের, আর ধ্বনিগুলি বাংলার। সংস্কৃতে বর্ণ আর ধ্বনির অসাম্য ছিল না, প্রতিটি বর্ণেরই ছিল স্বতন্ত্র ধ্বনি, স্বতন্ত্র উচ্চারণ। কিন্তু সংস্কৃতের সেসব বর্ণ বাংলায় এসে বাংলার নিজস্ব ধ্বনির সঙ্গে অংশত মিলছে, অনেকটাই মিলতে পারছে না। ২(ক) থেকে ২(ঘ)-এর অসংগতিগুলি তারই ফল। অন্যদিকে সংস্কৃতে অ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ না থাকার কারণে বাংলা বর্ণমালাও বাংলাভাষার গুরুত্বপূর্ণ এই ধ্বনিটির পক্ষে যোগ্য কোনও বর্ণের বরাদ্দ করে উঠতে পারে নি। ২(ঙ) এর অসংগতি এটাই। এর পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি ধ্বনির (Z) কথাও ভাবতে পারি, বাংলাভাষার অর্ন্তভুক্ত হয়েও যাদের যথাযোগ্য বর্ণ জোটে নি এখনও। Z-এর উচ্চারণ বোঝাতে পরশুরামকে লিখতে হল—'হয় হয়, Zা নতি পার না'। রবীন্দ্রনাথ তো অনেক আগেই (১৯৩১)-এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন—'যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্ছে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক।' এর সঙ্গে একটুখানি নৈরাশ্যও ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে—'আমাদের মনটা সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।'

বর্ণ আর ধ্বনি-উচ্চারণের এসব অসংগতি দূর করে বাংলা বানানকে আরও সরল এবং বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য মূলত এইরকম প্রস্তাব এসেছে বলে অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানিয়েছেন—

ক. বর্জনের প্রস্তাব ঃ

যেসব বর্ণ বাংলায় উচ্চারিত হয় না সেগুলি বর্জন করা হোক, যেমন ঈ ঊ ঋ ঌ ণ য অন্তঃস্থ-ব য। আর ৎ বর্জিত হোক, কারণ শুধু ত দিয়েই কাজ চালানো যায়.....। অনুস্বার বা ঙ-এর যেকোনো একটি বর্জিত হোক।

খ. সংযোজনের প্রস্তাব ঃ

'অ্যা' ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ তৈরি এবং সংযোজিত হোক।

গ. সরলীকরণের প্রস্তাব ঃ

ঐ ঔ যুক্তস্বর। বাংলায় আরও অন্তত পনেরোটি এ ধরনের যুক্তস্বর আছে—আয়, আই, অয় ইত্যাদি। সেগুলি যদি ভেঙে লেখা যায় ঐ ঔ-কে ওই ওউ ....লেখা যাবে না কেন?'

ক-প্রস্তাবের অর্ন্তগত ঌ আর অন্তঃস্থ-ব সম্পর্কে পবিত্রবাবুর বক্তব্য—'ঌ বাদ দেব এই কারণে যে, কোনো বাংলা শব্দ লেখায় ঌ-এর ব্যবহার নেই....সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব ছিল 'ওয়' বা ইংরেজি w-এর মতো উচ্চারণে। বাংলায় 'ব' লিখে সে উচ্চারণ আমরা কখনোই করি না। তার সঙ্গে প ফ ব-এর যে ব—তার কোনো তফাতই নেই। তাহলে এই অবান্তর বর্ণটিকে রাখি কেন বর্ণমালায় খামোখা। একটি ব দিয়েই আমাদের দিব্যি কাজ চলে যাবে।'

অধ্যাপক সরকারের এই বক্তব্যের আগেই 'চলন্তিকা' থেকে এবং পরে 'বানান অভিধান' থেকে ঌ আর অন্তঃস্থ ব বাদ পড়ে গেছে, এটা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। কেবল কোনও কোনও শিশুপাঠ্য বই-এর পাতায় বর্ণদুটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। বাংলা উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব যেমন নেই, তেমনি নেই ঈ-ঊকারের দীর্ঘতা, ঋ-কারের স্বরত্ব। সার্থকতা নেই একই উচ্চারণে দুটি বা তিনটি বর্ণকে পাশাপাশি ধরে রাখার (ঙ-ং জ-য ত-ৎ শ-ষ-হ ঃ ঞ-ণ-ন)। অতএব, সংগত কারণেই মান্য করা যায় ক-চিহ্নিত 'বর্জনের প্রস্তাব', একই কারণে বর্জন করা যায় 'ঃ'-কেও।

লক্ষ করুন, ক-চিহ্নিত 'বর্জনের প্রস্তাব' (ঃ-কে যুক্ত করে) মান্য হলে মুছে যাবে ২(ক)-এর অর্ন্তগত একাধিক বর্ণের একই উচ্চারণের অসংগতি, একটি বর্ণ নির্দেশ করবে একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণকে, বর্ণসংখ্যা ১৭ থেকে নেমে আসবে ৮টিতে (ই, উ, ঙ, জ, ত, শ, হ, ন)। সেই সঙ্গে মুছে যাবে ২(ঘ)-এর অর্ন্তগত, অবান্তর ঋ-বর্ণটি।

খ-চিহ্নিত 'সংযোজনের প্রস্তাব' গ্রাহ্য হলে মিটে যাবে ২(ঙ)-র অর্ন্তগত বর্ণহীন অ্যা-উচ্চারণের নিজস্ব বর্ণের অভাব। আর, গ-চিহ্নিত 'সরলীকরণের প্রস্তাব' কার্যকর হলে ২(গ)-র অর্ন্তগত ঐ আর ঔ তাদের 'একটি বর্ণে দুটি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণের' অনাবশ্যক দায় থেকে মুক্ত হতে পারে, পরিবর্তে দুটি করে বর্ণের প্রয়োগ চলতে পারে দুটি ধ্বনির উচ্চারণে (ও-ই, ও-উ)। অর্থাৎ, ক খ গ-চিহ্নিত প্রস্তাব তিনটি গৃহীত হওয়ার অর্থ আমাদের ২(ক) ২(গ) ২(ঘ) আর ২(ঙ)-র অর্ন্তগত বর্ণ-উচ্চারণের অসংগতির সঙ্গে জড়ানো ২০-টি বর্ণের মুক্তিলাভ। কেবল বাকি থাকে ২(খ)-এর অর্ন্তগত 'একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ (অ, আ, এ, স)'। তবে এই তুচ্ছ অসংগতি আমরা সহজেই দূর করতে পারি উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণ প্রয়োগ করে। যেমন ধরুন, আমরা লিখব 'অমনি'-র বদলে 'ওমনি', 'এক'-এর বদলে 'অ্যাক', 'বসতি'-র বদলে 'বশতি'।

ধরা যাক, পবিত্রবাবুর উল্লেখ থেকে পাওয়া তিনটি প্রস্তাবই বাংলাভাষী মানুষ গ্রহণ করলেন, এবং বাংলাভাষার বর্ণ আর উচ্চারণের মধ্যে সামগ্রিকভাবেই একটি সহজ সম্পর্ক তৈরি হল। সংস্কৃতভাষার বর্ণ-উচ্চারণে যে সমতা ছিল, বাংলা-বর্ণ-উচ্চারণেও তাই ঘটল। তাহলে আমাদের বর্ণমালার চেহারাটা হবে এই রকম—

অ	আ	অ্যা			
ই	উ	এ	ও		স্বরবর্ণ = ৭
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ		
ট	ঠ	ড	ঢ		
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
র	ল	শ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ঁ		ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩২
					মোট বর্ণসংখ্যা = ৩৯

বাংলা বানান-সংস্কারের প্রসঙ্গে বর্ণমালার পরিবর্তনের প্রস্তাব বারে বারেই উঠেছে। কিন্তু বর্ণমালার পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। সেইকারণে, শতাধিক বছরের পুরোনো বিদ্যাসাগরী বর্ণমালা থেকে কেবলমাত্র ২টি বর্ণের (৯ আর অন্তঃস্থ-ব) উচ্ছেদ ঘটিয়েই বাংলা আকাদেমিকেও থামতে হল। অতএব, এইমাত্র যে বর্ণমালার ছকটি দেখতে পেলেন,

তা যতই বাঞ্ছিত হোক, অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশ্য হয়ে ওঠা তার পক্ষে অসাধ্য। বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসাম্য যতদিন থাকবে, বাংলা বানানের সমতাবিধানও ততদিন দুঃসাধ্যই থেকে যাবে।

১১৪.৪.১ সারাংশ—২

বানান-সমস্যার সমাধান করতে বর্ণ আর উচ্চারণের সম্পর্ককে সহজ করার ভাবনা চলছে দীর্ঘকাল ধরে। বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক বলতে বুঝব একটি বর্ণের একটিই নির্দিষ্ট উচ্চারণ অথবা একটি ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট বর্ণের প্রয়োগ। চলতি বর্ণমালার অর্ন্তগত ৫০টি বর্ণের সঙ্গে প্রচলিত উচ্চারণের সম্পর্ক মিলিয়ে দেখলে আপনি জানতে পারবেন, ২৬টি ক্ষেত্রে বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েই আছে। বাকি ২৪টি ক্ষেত্রে বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্কে অসংগতি এখনও রয়েছে। এর প্রথম কারণ, বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার আদলেই তৈরি। অথচ, সংস্কৃতের অনেক ধ্বনি বা উচ্চারণ বাংলায় এখন নেই। দ্বিতীয় কারণ, সংস্কৃতে ছিলই না এমন ধ্বনিও (অ্যা) বাংলায় এসেছে। এমনকী, দুটি-একটি বিদেশি ধ্বনি বাংলাভাষার অর্ন্তভুক্ত হয়েও যথাযোগ্য বর্ণ পায় নি (Z)।

বর্ণ-উচ্চারণের এসব অসংগতি দূর করে বানানকে সরল করার পক্ষে মূলত তিনটি প্রস্তাবের উল্লেখ অধ্যাপক পবিত্র সরকার করছেন—

(ক) বর্জিত হোক অনুচ্চারিত ঈ ঊ ঋ ঌ ঞ ণ য অন্তঃস্থ-ব ষ, অনাবশ্যক ৎ আর ং-ঙ-এর যেকোনো একটি।

(খ) যুক্ত হোক 'অ্যা' ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ।

(গ) সরলীকরণ হোক ঐ ঔ-এর মতো যুক্তস্বরগুলির, লেখা হোক ওই ওউ ইত্যাদি।

ক-চিহ্নিত বর্জনের প্রস্তাব মেনে নিলে একাধিক বর্ণের একই উচ্চারণ থাকার সমস্যাটি মুছে যাবে। খ-চিহ্নিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হলে বর্ণহীন 'অ্যা'-ধ্বনিটি পাবে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ। গ-চিহ্নিত সরলীকরণের প্রস্তাব কার্যকর হলে যুক্তস্বরের জন্য পৃথক বর্ণ অনাবশ্যক হয়ে পড়বে, বানান সহজ হবে। এই তিনটি উপায়ে বর্ণ-উচ্চারণের অসংগতি দূর হতে পারে ২০টি বর্ণের ক্ষেত্রে। এছাড়া, বাকি ৪টি বর্ণের (অ, আ, এ, স) একাধিক উচ্চারণের সমস্যাটিও সহজেই দূর করা সম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণ প্রয়োগ করে ('অমনি-র বদলে 'ওমনি', 'এক-এর বদলে 'অ্যাক', 'বসতি'-র বদলে 'বশতি' লিখে)। এমনি করে বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্কটি যখন সহজ হয়ে আসবে, বাংলা বর্ণমালার বর্ণ-সংখ্যাও তখন ৫০ থেকে নেমে আসবে মাত্র ৩৯-এ। বাংলা বানানে সমতা আনতে এই প্রক্রিয়া এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

১১৪.৪.২ অনুশীলনী—২

১. বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের সংগতি আর অসংগতির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি পরপর দেখিয়ে দিন।

২. বাংলা বর্ণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩. বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতি দূর করার পক্ষে বানান-ভাবুকদের কাছ থেকে কী ধরনের প্রস্তাব উঠে আসছে এবং সেসব প্রস্তাব কার্যকর হলে অসংগতি কীভাবে কতটা দূর হতে পারে, এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪. (ক) নীচের বর্ণগুলির সঙ্গে উচ্চারণের সম্পর্ক কী ধরনের, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখান—অ, ঋ, এ, ঔ, ঝ, স।

(খ) নীচের উচ্চারণগুলির জন্য বাংলায় কোন্ কোন্ বর্ণ প্রয়োগ করা হয়, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখান—ই, অ্যা, জ, ত, ন, শ, হ।

(গ) বাংলায় কোন্ কোন্ বর্ণের ২টি করে উচ্চারণ, বানানের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

(ঘ) বাংলায় কোন্ কোন্ উচ্চারণের জন্য ২টি করে বর্ণের প্রয়োগ ঘটে, বানানের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

১১৪.৫ সহায়ক পাঠ

একক-৩-এর আলোচ্য বিষয় বুঝতে সুবিধে হবে নীচের বইগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক লেখাগুলি পড়ে নিলে—

১. মণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা ‘বাংলা বানান’ থেকে ‘বর্ণ-বিভ্রান্তি’। (দে’জ তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০)।

২. ‘প্রসঙ্গ বাংলাভাষা’-য় সংকলিত জগন্নাথ চক্রবর্তীর লেখা ‘বাংলা লিপিসংস্কার’ প্রবন্ধটি। (প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)।

৩. পবিত্র সরকারের লেখা ‘বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ বইটি থেকে পৃ. ৩১-৪৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯২, চিরায়িত প্রকাশন)।

এছাড়া, উৎসাহী শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা ‘বাঙালির ভাষা’ (আনন্দ পাবলিশার্স) বই থেকে ‘বাংলা বর্ণমালা ও লিখনরীতি’ আর ‘বাংলা উচ্চারণের নানান প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য’ অংশদুটিও পড়ে নিতে পারেন।

একক ১১৫ ❑ বাংলা বানানের সরলীকরণ ও তার সীমা

গঠন

১১৫.১ উদ্দেশ্য

১১৫.২ প্রস্তাবনা

১১৫.৩ মূলপাঠ-১ ঃ সরলীকরণ নিয়ে ভাবনা।

১১৫.৩.১ সারাংশ-১

১১৫.৩.২ অনুশীলনী-১

১১৫.৪ মূলপাঠ-২ ঃ সরলীকরণের প্রয়োগ

১১৫.৪.১ সারাংশ-২

১১৫.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৫.৪ মূলপাঠ-৩ ঃ সরলীকরণের উদাহরণ।

১১৫.৫.১ সারাংশ-৩

১১৫.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১৫.৬ সহায়ক পাঠ

১১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির লক্ষ্য আপনাকে জানানো যে, যেমন-খুশি বানান-লেখা যেমন দোষের, সঠিক নীতির বাইরে গিয়ে বানানের যেমন-খুশি সরলীকরণ করা তেমনটাই বিপদের। সেইসঙ্গে এককটি আপনাকে দেখিয়ে দেবে, বানানকে সহজ সরল করা কীভাবে সম্ভব, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা। এককটির মাধ্যমে বানানে সমতা আনবার প্রয়োজনে যেসব সূত্র প্রয়োগের পদ্ধতি তুলে ধরা হল, সেদিকে মনোনিবেশ করলে আপাতত কোন্ শব্দে নতুন বানান আর কোন্ শব্দে প্রচলিত বানান লিখবেন—এ নিয়ে সব রকমের সংশয় ক্রমশ কেটে যাবে।

১১৫.২ প্রস্তাবনা

একক-২ এ দেখলেন, বাংলা বানানের মূল সমস্যা আসলে বানানে সমতাবিধানের সমস্যা। একক-৩ এ দেখা গেল, বানানে সমতা আনা সম্ভব বর্ণ আর ধ্বনি-উচ্চারণে সহজ সম্পর্ক তৈরি করে—প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট একটিমাত্র উচ্চারণ মেনে নিয়ে। আমাদের আসল লক্ষ্য অবশ্যই বাংলা বানানকে ক্রমশ সরল থেকে আরও সরল এবং স্বচ্ছ করে তোলা। বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্ক তৈরি করে বানানে সমতা আনা বানানের সরলীকরণের পক্ষে আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু, সরলীকরণের কাজটা মোটেই সরল সহজ নয়। এটা একটা দীর্ঘকালীন আন্দোলন, এ আন্দোলনে এগোতে হয় ধাপে ধাপে এবং এর প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সতর্ক।

চলতে চলতে ক্রমশ এটাও বোঝা যাবে যে, চলার পথ অনন্ত নয়, এর একটা সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমানায় এসে থামতেই হবে, অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য হলেও। আসুন, চলতি এককে, বাংলা বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য, উদাহরণের সাহায্য নিয়ে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি।

১১৫.৩. মূলপাঠ—১ ঃ সরলীকরণ নিয়ে ভাবনা

ধরুন, একটা সময় ছিল (উনিশ শতকে) যখন 'সঙ্গ্রহ' 'সম্বাদ' বানানই চালু ছিল। ক্রমশ তা সরল হয়ে 'সংগ্রহ' 'সংবাদ' বানানে আজকের চেহারা নিল। অথচ, এই সংগ্রহ-সংবাদের পাশাপাশি সঙ্গীত-সঙ্কেত এখনও চলছে। বিকল্প বিধানে সঙ্গীত-সংগীত সঙ্কেত-সংকেত দুটোই লিখছি খুশিমতো। এখানেই সমতার অভাব। ধরা যাক, একটা সময় এল যখন সবাই বানানবিধি মেনে সংগ্রহ-সংবাদের মতো সংগীত-সংকেতও লিখছি। কিন্তু ক্রমশ ঙ্গ-ঙ্ক ভেঙে 'ং' লেখার হুজুগে সংগী-অংগ-বংগ-শংকার জোয়ারে 'ঙ' যদি ভেসে যায়, তাহলে একটা বিধির বাঁধ বেঁধে বলতেই হবে, 'ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসেবেই ং-কে আসতে হবে, নইলে নয়।' অর্থাৎ, বানানে সমতা অবশ্য চাই, সেইসঙ্গে তার সীমানাটাও বোঝা চাই। ঙ্ক ঙ্গ— এসব যুক্তবর্ণের বদলে 'ং' দিয়ে লেখায় বানান অবশ্যই সরল হবে, কিন্তু তার সীমানা সংগ্রহ-সংগীত-সংকেত পর্যন্তই, সংগী-অংগ-বংগ-শংকা তার বাইরে। ছন্দতত্ত্ববিদ প্রবোধচন্দ্র সেন অবশ্য 'সংগী' 'বংগ' বানানের সরলীকরণকেও অনুমোদন করেছিলেন। আর-একটি উদাহরণ দেখুন বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্কের, দেখুন বানানের সরলীকরণ এবং

তার সীমা। মান্য চলিত বাংলা উচ্চারণে 'য' নেই, 'স' আছে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে, 'শ'র দাবি প্রায় সর্বত্র। ধরা যাক, সেই দাবি মেটাতে গিয়ে 'য' আর 'স'কে উচ্ছেদ করে তার জায়গাটিতে 'শ' বসিয়ে দেবার ছাড়পত্র বানান-লেখকেরা পেয়ে গেলেন। 'সবিশেষ' বানানের জটিলতা কেটে শব্দটি 'শবিশেশ' হল। 'শবুজ ঘাশের' পাশে হলুদ 'শরশে' ফুল দেখতে দেখতে 'শোজা' পথে হেঁটে 'শহরে' পৌঁছনো গেল। কিন্তু, বাঙালির অভ্যস্ত চোখ 'সবুজ ঘাস' আর হলুদ 'সর্ষে' ফুলই দেখতে চাইবে। অবশ্য 'শহরে' তার আপত্তি নেই, যদি পথ 'শোজা' না হয়ে 'সোজা'ই থাকে। আর 'সবিশেষ' বানানটিও তৎসম-মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে 'শ'-কে তার প্রাপ্য জায়গাটুকুর বাইরে বাড়তি প্রশ্রয় দিতে চাইবে না।

এবার দেখা যাক, বাংলা বানানের সরলীকরণ আর তার সীমা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ কে কী বলছেন—

১. **প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ** 'সঙ্গ্রহ' বানানটি যেকালে 'সংগ্রহ' লেখা হতে শুরু হয় তখন কিন্তু পূর্ব্ব নির্ম্মল সূর্য্য এসব রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্বের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। এরও আগে গর্ভ সর্প তর্ক শব্দগুলি গর্ধ সর্প্প তর্ক্ক রূপে লেখা হত। ক্রমে বানান সরল হতে থাকে। বানানের এসব সরলীকরণ বৈয়াকরণেরা মেনে নেন।....সঙ্গী বঙ্গ এসব শব্দও সংগী বংগ হিসাবে লেখা হতে লাগল।....আমার কিন্তু মত হল যে, এইসব বানান স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এতে ভ্রান্তি কম হবে এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও কিছু কমবে।'

২. **ভূদেব চৌধুরী ঃ** 'সুশৃঙ্খল সরলীকরণের উদ্যম অল্পদিনেই এলোমেলো হয়ে গেল অজ্ঞানকৃত সাদৃশ্য-analogy-রচনার কপোলকল্পিত স্বেচ্ছাচারে। 'পূর্ণ'-তে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ছিল না, 'সর্ব্ব'তে ছিল—নতুন সরলীকরণে সে দ্বিত্ব ঘুচেছে। সেই যুক্তিতে 'গুরুত্ব' 'ঘনত্ব'-র কপোলকল্পিত সাদৃশ্য বিবেচনায় 'বৃহত্ব', 'মহত্ত্ব'রও অঙ্গচ্ছেদ হল 'বৃহত্ব', 'মহত্ব'। কিংবা কোনো কোনো স্থলে 'ঙ্গ'-র বদলে 'ং' বিহিত হতেই ঝোঁক দেখা দিল ঐ অজ্ঞানকৃত সাদৃশ্য সাধনের—'সংগতি' এবং 'সংগীত' যদি হয়, তবে 'সংগ' নয় কেন?—এ ভ্রান্তি 'বংকিম' 'শংখ' পর্যন্ত ছুটেছে। কারণ একটাই ভাষা-চরিত্র, তার ব্যাকরণের কোনোরূপ জ্ঞান না রেখেই অনুমতি সাদৃশ্য সূত্রে যথেচ্ছ সরলীকরণের নির্বিচার উদ্যম। বিভ্রাটও তাতে কম হয় না। 'তৎসম' শব্দে সরলীকরণের অজুহাতেই 'ৎ' আজ লুপ্ত হয়ে পড়েছে। 'ভাত' তদ্ভব শব্দ; বাংলা ভাষায় পদান্ত 'অ' অনুচ্চারিত থাকে, তাই 'ভাৎ' না লিখে লিখি 'ভাত'-ই। কিন্তু সেই সাদৃশ্যের যুক্তিতে তৎসম 'জগৎ'কে লিখি 'জগত'। আর তারই অনুসরণে 'পথিকৃৎ'-কে 'পথিকৃত' লিখি যদি, অর্থই এলোমেলো হয়ে যায়। 'পথিকৃৎ' বলতে বুঝি 'পথের রচয়িতা' কিন্তু 'পথিকৃত' হল 'পথে যা করে রাখা হয়েছে।' এমন সব উদাহরণ অবশেষ হতে পারে।'

৩. **ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ** 'বাংলা বানানকে বৈজ্ঞানিক সরলতা দেবার জন্য একটা সংস্কার আন্দোলন প্রয়োজন। .....উচ্চারণকে ভিত্তি করেই বানান।.....আমার প্রস্তাব....যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া, এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না-আনা। .....সর্ব্ব খর্ব্ব কার্য্য বদলে সর্ব-খর্ব-কার্য হয়েছে। পাখী হয়েছে পাখি, বাড়ী—বাড়ি। 'দারিদ্র্য'-র 'য' কখন খসে গিয়েছে য়্য প্রত্যয়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। 'বৌ' হল 'বউ', 'দৈ' থেকে 'দই'। .....বানানের ব্যাপারে ক্রমিক সরলতার দিকেই কালের গতি। লেখকেরা এবং ভাষাবিদ-ব্যাকরণবিশেষজ্ঞরা সচেতন ভাবনায় বাংলা বানানকে সরল সহজ করে আনছেন। লেখকদের যুক্তি প্রায়ই উচ্চারণের কাছাকাছি থাকা, ভাষাবিদরা তত্ত্বগত কারণ দেখান। সে যাই হোক বানানের জটিলতা কমাতে এটা সকলেই মানেন। পেছন ফিরে এই শিক্ষাটাই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল কতদূর যাব?.....লেখাকে সহজ করার জন্য, বানানের জটিলতা কমাবার জন্য এদের (ই-ঈ এবং উ-ঊ) একটিকে রাখা চলে। ই, উ প্রবণতা বানানে তো প্রবল হয়ে উঠছে। তৎসম পূজা পূর্ব-এর স্থানে তদ্ভব-পুজো পুব চলছেই। হস্তী থেকে হাতি, পক্ষী থেকে পাখি তো হয়ে বসে আছে।.....তৎসমের কুসংস্কার চলে গেলে পূর্ব পুজা হস্তি লিখতে হাত কাঁপবে না। ....ঋ বাংলায় একটা বাড়তি বোঝা। সবাই জানেন, ঋণ = রিন। বৃক্ষ = ব্রিক্খ। ...রাণী এখন রানী হয়েছেন।...বাংলার সব ণ-ই ন হয়ে যেতে পারে।...যুক্তব্যঞ্জনের যেগুলির উচ্চারণ বাংলায় নেই সেগুলি ত্যাগ করাই সঙ্গত। ক্ষ = ক্ষ = ক্খ = খ্খ। অন্যগুলি নয়। কিন্তু 'যত্ন'-কে 'যত্ন' লেখা গেলে যুক্তাক্ষরের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া যায়।....'লণ্ডন'-এর থেকে 'লন্ডন' অনেক বৈজ্ঞানিক। 'ণ্ড' বলে একটি নতুন বর্ণ ও নতুন উচ্চারণ শিখতে হয় না। অথচ কাম্য ধ্বনিটি অলভ্য থাকে না।

জনশিক্ষা যদি সর্বজনীন করতে হয়, মাতৃভাষার রূপকে সরলতম করতেই হবে। বানান বর্ণমালায় অকারণ জটিলতা তৈরি করে শিক্ষার আকর্ষণ যেন কমিয়ে ফেলা না হয়। ....ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও ভাবতে হয়।'

আমরা দেখলাম, বিশেষজ্ঞ তিনজনই বাংলা বানানে সরলীকরণে বিশ্বাসী। বানান জটিলতা পেরিয়ে ক্রমশ সরল হোক, এ ব্যাপারে সবাই একমত হলেও সেই সরলীকরণ কতদূর পর্যন্ত এগোবে, সেই সীমারেখাটা নিয়ে এঁদের মতভেদ রয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সরলীকরণের কোনও সীমানা চিহ্নিত করেননি, সাধারণভাবেই একে স্বাগত জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তও সরলীকরণের পক্ষে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চান। তাঁর বিবেচনায় বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী যেসব বর্ণ (ঈ-ঊ-ঋ-ঐ-ঔ, ঙ-ঞ-ণ-শ-ষ অন্তঃস্থ ব-ঃ-ৎ) তাদের উচ্ছেদ করে সরলীকরণের গণ্ডিটাকে অনেকখানি বিস্তার দেওয়া সম্ভব। এমনকী, অনাবশ্যক 'ক্ষ'-কে বর্জন করা আর অন্যসব যুক্তব্যঞ্জনের 'বিষদাঁত ভেঙে' দেবারও পক্ষে তিনি। তবে, উচ্চারণ-অনুসারী বানানের প্রতি পক্ষপাত নিয়েও অধ্যাপক গুপ্ত সরলীকরণের এই প্রক্রিয়ায় একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন—'আমার প্রস্তাব.....যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া, এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না-আনা।'

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী চান 'সুশৃঙ্খল সরলীকরণ'। ব্যাকরণ আর বিধিনিয়মের বাইরে সরলীকরণের যে অসতর্ক ঝোঁক, সেদিকে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'সর্ব্ব' থেকে 'সর্ব' সুশৃঙ্খল সরলীকরণ, কিন্তু 'গুরুত্ব-ঘনত্ব'-র দেখাদেখি 'বৃহত্ব-মহত্ব' তাঁর দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচার। তাঁর বিবেচেনায় 'সঙ্গতি-সঙ্গীত' থেকে 'সংগতি-সংগীত' সুশৃঙ্খল সরলীকরণের দৃষ্টান্ত, 'সঙ্গ-বঙ্কিম-শঙ্খ' থেকে 'সংগ-বংকিম-শংখ' আসলে 'যথেচ্ছ সরলীকরণের নির্বিচার উদ্যম।' তদ্ভব 'ভাত'-এর দেখাদেখি তৎসম 'জগৎ-পথিকৃৎ'-এর বদলে যদি সরলীকরণের যুক্তিতে 'জগত-পথিকৃত' হয়, তবে এটিও হবে একইরকম বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব দেওয়া বা না-দেওয়া (সর্ব-গুরুত্ব-ঘনত্ব, কিন্তু-বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব), ঙ বা ং-এর প্রয়োগ (সংগতি-সংগীত, কিন্তু সঙ্গ-বঙ্কিম-শঙ্খ, ত বা ৎ-এর প্রয়োগ (তদ্ভব 'ভাত', কিন্তু তৎসম 'জগৎ-পথিকৃৎ')—এসব ক্ষেত্রে সীমানাটা জানা চাই, বিধিনিয়মের তৈরি সীমানা। অধ্যাপক চৌধুরী সরলীকরণের সীমা-নির্দেশ করতে চান এইভাবেই।

এবার এই প্রসঙ্গটি নিয়ে 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বইটিতে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের পরামর্শ শোনা যাক। তাঁর মতে বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য দুটি জিনিসের সংস্কার জরুরি—প্রথমটি বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, দ্বিতীয়টি লিখন-পদ্ধতির সংস্কার। 'বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার' বলতে বুঝে নিন বর্ণচিহ্নের সঙ্গে মান্য চলিত বাংলার উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া, অর্থাৎ 'এক ধ্বনি, একটি প্রতীক'—এই নীতিতে যথাসাধ্য পৌঁছে যাওয়া। একক-৩-এ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর ফলে বর্ণসংখ্যাও যে কমে গিয়ে ৫২ থেকে ৩৯-এ নেমে যাওয়া সম্ভব, তা-ও লক্ষ করেছেন। এর সরাসরি সুবিধা এই, এখনকার বানানে ই-ঈ-উ-ঊ-য শ-ষ-স ণ-ন নিয়ে

যে জটিলতা রয়েছে, তা অনেকখানি কেটে যাবার সম্ভাবনা। কেননা, এ ব্যবস্থায় কোনও উচ্চারণেই একটির বেশি বর্ণ নেই, কোনও বর্ণেরই একটির বেশি উচ্চারণ নেই।

এরপর আসছে লিখন-পদ্ধতির কথা। বাংলা শব্দের বানান লেখার পদ্ধতিতে মুখ্যত তিন ধরনের জটিলতার দিকে অধ্যাপক সরকার দৃষ্টি দিতে বলছেন—

১. ধ্বনিগুলিকে পরপর যেভাবে উচ্চারণ করে চলি, লেখায় তাদের বর্ণচিহ্নগুলি সব সময় পরপর সেভাবে সাজাই না। যেমন, 'কে তিনি' কথাটিকে উচ্চারণ করছি এইভাবে—ক-এ-ত-ই-ন-ই, লিখছি অন্যভাবে—ে-ক-ি-ত-ি-ন। আরও দেখছি, ই-কার এ-কার ঐ-কার ব্যঞ্জনের বাঁদিকে (কি-কে-কৈ)

আ-কার ডানদিকে (কা),-ঈ-কার ডানদিক থেকে এসে ব্যঞ্জনের মাথার উপরে (কী), উ-ঊ-ঋ-কার ব্যঞ্জনের তলায় (কু-কূ-কৃ), ও-ঔ-কার ব্যঞ্জনের ডান-বাঁ দুদিকেই (কো-কৌ)।

২. কোনও কোনও বর্ণচিহ্নের দেখছি নানারকম চেহারা। একই উ-কারের অন্ততপক্ষে চার রকমের রূপান্তর কীভাবে ঘটছে দেখুন—ক্ + উ = কু, র্ + উ = রু, হ + উ = হু, শ্ + উ = শু।

৩. এমন কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন বাংলায় রয়েছে, যেখানে কোন্ কোন্ ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যেমন, ক্ষ (= ক + ষ), ঙ্গ (= ঙ + গ), হ্ম (= হ + ম), ক্ত (= ক + ত), দ্ধ (= দ + ধ), ব্ধ (= ব + ধ), ট্ট (= ট + ট), গ্ধ (= গ + ধ), ন্ধ (= ন + ধ)।

উপরের এই জটিল পদ্ধতি থেকে বাঁচিয়ে বাংলা বানানকে সরল করা যাবে কীভাবে, এ সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বললেন—'এই মুহূর্তে মনে করি, বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব ই-কার, এ-কার ইত্যাদি চিহ্ন ব্যঞ্জনের পরে লেখার ব্যবস্থা করলে....., বর্ণের রূপভেদ বা অ্যালোগ্রাফের সংখ্যা কমালে,.....এবং কিছু 'অস্বচ্ছ' যুক্তব্যঞ্জনকে 'স্বচ্ছ' করে আনলে.....বাংলা বর্ণমালা ও লিখন-পদ্ধতির সংস্কারে কয়েকটা বড় ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে।'

লক্ষ করুন, জটিল লিখন-পদ্ধতিকে সরল করার উপরের তিনটি ধাপ এইরকম হওয়া সম্ভব—

১. বর্ণচিহ্ন-বিন্যাসের জটিলতা ঃ

জটিল বিন্যাস (উচ্চারণ-বিরুদ্ধ)	**সরল বিন্যাস (উচ্চারণ-সংগত)**
কে তিনি (ে-ক-ি-ত-ি-ন)	কতেনি (ক-ে-ত-ি-ন-ি)

২. বর্ণরূপ-ভেদের জটিলতা ঃ

জটিল রূপভেদ	**সরল একটিমাত্র রূপ**
কু, রু, হু, শু	কু, রু, হু, শু

৩. অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের জটিলতা ঃ

অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন (জটিল)	**স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন (সরল)**
ঙ্গ, হ্ম, ক্ত, দ্ধ, ট্র,	ঙ্গ, হ্ম, ক্ত, দ্ধ, ট্‌ট

২-নং আর ৩-নং ধাপে জটিল বানান থেকে সরল বানানে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ক্রমশ চালু হতে দেখা যাচ্ছে। তবে ১-নং ধাপটিতে আগে প্রয়োজন ই-কার এ-কারের চেহারা বদল করে এদের ব্যঞ্জনের ডানদিকে বসানোর যোগ্য করে তোলা—আ-কার ঈ-কার (া -ী) যেমন বাঁ-এ ব্যঞ্জনের দিকে একটুখানি হেলে থাকে, সেইরকম কিছু-একটা করা।

ধরা যাক, বর্ণমালার উপাদান আর বাংলা লিখন-পদ্ধতির সংস্কার (বর্ণচিহ্নবিন্যাস বাদে) যথাসম্ভব করা গেল। বাংলা বানানের সব রকমের জটিলতা থেকে বানানকে সরল করার সব পথ খুলে গেল। বাংলা বর্ণমালা এখন ৩৯টি বর্ণ নিয়ে (স্বরবর্ণ ৭টি আর ব্যঞ্জন বর্ণ ৩২টি) সংহত এবং সম্পূর্ণ, অবান্তর বর্ণ একটিও নেই অথচ আবশ্যক বর্ণ সবগুলিই রয়েছে এই বর্ণমালায়। ধরে নিন, কোনও বর্ণচিহ্নের বাড়তি রূপভেদ (Allograph) নেই, প্রতিটি যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ। অর্থাৎ, উচ্চারণ-মেনে-চলা সরল সহজ বানান লেখার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী একটি বর্ণমালা নিয়ে বাংলা ভাষা এখন তৈরি। এবার দেখা যাক, সরলীকরণের এই সার্বিক আয়োজন বাংলা শব্দ-বানানকে কতদূর পৌঁছে দিতে পারে এবং বানান-পাঠকের কাছে তা কতটা গ্রহণীয় হতে পারে।

বর্ণচিহ্নের রূপভেদ কমিয়ে আনা আর যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করে তোলা যে সরল সহজ বানান তৈরির পক্ষে সহায়ক, এ নিয়ে মতবিরোধ নেই। এমন কী, মান্য চলিত বাংলার নির্দিষ্ট উচ্চারণে নির্দিষ্ট বিকল্পহীন বর্ণ প্রয়োগ করাও যে বানানকে সহজ করার একটা উপায়, একথাও অনেকেই মানতে চান। এক্ষেত্রে তফাতটা কেবল ঐ প্রয়োগের সীমানা নিয়ে। এই সীমানাটাই আমরা এখন যথাসম্ভব খুঁজে বের করতে চাই।

১১৫.৩.১ সারাংশ—১

বানান নিয়ে যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা, তার মূল লক্ষ্য বানানের সরলীকরণ ও সমতাবিধান। এটা সম্ভব হবে বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে। কাজটা অবশ্য সহজ নয়, এবং এর একটা সীমাও আছে। 'সঙ্গ্রহ' যেমন ক্রমশ 'সংগ্রহ' হয়েছে, তেমনি সঙ্গীত-সংগীত বা সঙ্কেত-সংকেত এই দুরকম বানানের দ্বিধা কাটিয়ে 'সংগীত' 'সংকেত' নির্দিষ্ট হলে বানানে সমতা আসবে, সরলীকরণ হবে। কিন্তু সংগী-অংগ-শংকা এখনই চলবে না। 'সবিশেষ' বানানের 'শ-স-য' এর জটিলতা কাটাতে গিয়ে উচ্চারণ-অনুসারী 'শবিশেশ' লিখতে গেলে বানান নতুন জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে। অতএব, সরলীকরণের সীমানা বেঁধে দিতেই হয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন-ভূদেব চৌধুরী-ক্ষেত্র গুপ্তর মতো বিশেষজ্ঞ তিনজনই বাংলা বানানে সরলীকরণের পক্ষে। তবে এর সীমা নিয়ে এঁরা ভিন্নমত। প্রবোধচন্দ্র সরলীকরণের সীমানা চিহ্নিত করেন নি। তাঁর মনে 'সঙ্গ্রহ' থেকে 'সংগ্রহ' বা 'তর্ক্ক' থেকে 'তর্ক' যেমন করে মানা হয়েছে, তেমন করেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো সঙ্গী-বঙ্গ থেকে 'সংগী-বংগ'-র মতো সরলীকরণ। ভূদেব চৌধুরী চান নির্দিষ্ট সীমারেখা। নইলে 'গুরুত্ব-ঘনত্ব'-র সাদৃশ্যে 'বৃহত্ব-মহত্ব' বা 'ভাত'-এর সাদৃশ্যে 'জগত-পথিকৃত' বানানের নতুন স্বেচ্ছাচার বাংলা বানানে নেমে আসতে পারে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত উচ্চারণ-অনুসারী বানানের পক্ষপাতী হয়েও সরলীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা চিহ্নিত করছেন, সরল প্রচলিত বানানকে উচ্চারণের নাম করে বদলাতে নিষেধ করছেন। তিনি কেবল চান, বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী বর্ণগুলির উচ্ছেদ করতে আর যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে দিতে।

বানান-সরলীকরণের পক্ষে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের পরামর্শ বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার আর লিখন-পদ্ধতির সংস্কার। প্রথমটির অর্থ বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি; দ্বিতীয়টির অর্থ ধ্বনিগুলিকে যেভাবে উচ্চারণ করি লেখায় সেভাবেই পরপর সাজিয়ে দেওয়া, বর্ণের রূপভেদ কমিয়ে আনা আর অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করে তোলা।

বানান-সরলীকরণ সবাই চান, সরলীকরণের উপায় নিয়েও তেমন মতভেদ নেই। তফাতটা কেবল এর সীমানা নিয়ে।

১১৫.৩.২ অনুশীলনী—১

১. বাংলা বানানে সরলীকরণ কীভাবে সম্ভব তা বুঝিয়ে দিন এবং সরলীকরণের সীমা সম্পর্কে বানান-ভাবুকদের মতামত উল্লেখ করে ঐ সীমা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করা সম্ভব, ব্যাখ্যা করুন।

২. 'বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য দুটি জিনিসের সংস্কার জরুরি'—কী কী জিনিসের সংস্কার জরুরি বলে প্রাসঙ্গিক ভাবুক ভাবছেন এবং এই সংস্কার-প্রক্রিয়া কীভাবে বানান সরলীকরণকে সম্ভব করে তুলতে পারে, আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩. বাংলা বানানের লিখন-পদ্ধতিতে কী কী ধরনের জটিলতা রয়েছে এবং সেসব জটিলতা থেকে বানান কীভাবে মুক্ত হতে পারে, বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিন।

১১৫.৪ মূলপাঠ—২ ঃ সরলীকরণের প্রয়োগ

উচ্চারণ মেনে বানান লেখা ততক্ষণ পর্যন্তই সংগত, যতক্ষণ তা প্রচলিত বানানের তুলনায় সরল সহজ হচ্ছে। কিন্তু, যদি দেখি, উচ্চারণ মানতে গিয়ে প্রচলিত বানানকে আরও জটিল করে তোলা হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই থামতে হবে। আপাতত পাঁচটি শব্দ হাতে নিয়ে কথাটা বুঝে নেওয়া যাক—সৈন্য, অভ্যেস, দৈ, ডাঙ্গা, গভর্ণর। এই পাঁচটিই প্রচলিত বানান। এদের উপর উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ করলে চেহারাটা এইরকম হবে—শোইন্নো (ঐ > ওই, ন্য > ন্নো), ওব্‌ভেশ্‌ (অ > ও, ভ্য > ব্‌ব, স > শ), দোই (ঐ > ওই), ডাঙা (ঙ্গ > ঙ), গভর্নর (ণ > ন)। লক্ষ করুন, প্রথম তিনটি বানানের পরিবর্তনে চেনা শব্দ-তিনটি আমাদের কাছে অনেকটাই অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সৈন্য-দৈ-অভ্যেস লেখার চেয়ে শোইন্নো-দোই-ওব্‌ভেশ্‌ লেখার শ্রমও খানিকটা বেশিই, অন্ততপক্ষে নতুন বানান-তিনটি যে চলতি বানানের চেয়ে সরল সহজ হল—একথা এই মুহূর্তে কেউ মানবেন না। অথচ, ডাঙ্গা-গভর্ণর বর্ণবদল করে যখন ডাঙা-গভর্নর হল, তখন তা মেনে নিতে কোনও বাধা রইল না। উচ্চারণটা জানা আছে বলে বানান-লেখায় কোনও সংশয়ও নেই। তবে 'দৈ' থেকে 'দোই' বানানে জটিলতার নালিশ থাকলেও 'দই' বানানটি দিয়ে আজকের বাঙালি একটা আপস-রফা করতেই পারেন। অতএব, শব্দ-পাঁচটির গ্রহণযোগ্য সরলীকৃত বানান হতে পারে এইরকম—সৈন্য অভ্যেস দই ডাঙা গভর্নর। অর্থাৎ, 'সৈন্য' আর 'অভ্যেস' প্রচলিত বানান বহাল রাখল। 'দৈ' বানানটির সরলীকররের সীমা 'দই' পর্যন্ত (ঐ >

অই), উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণবদলের প্রক্রিয়া এখানে অংশত সফল, পুরোপুরি সফল হত কিন্তু গ্রহণযোগ্য হত না 'দোই' (ঐ > ওই) হলে। 'ডাঙ্গা' আর 'গভর্ণর' নির্দ্বিধায় উচ্চারণ-মানা নতুন বানান স্বীকার করে নিয়ে 'ডাঙা' (ঙগ > ঙ) আর 'গভর্নর' (ণ > ন) হল। এই দুটি ক্ষেত্রেই বর্ণবদলের প্রক্রিয়া পুরোপুরি সফল।

লক্ষ করুন, নির্বাচিত পাঁচটি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের এক-একটি শ্রেণি থেকে নেওয়া—'সৈন্য' তৎসম, 'অভ্যেস' অর্ধ-তৎসম, 'দৈ' তদ্ভব, 'ডাঙ্গা' দেশি আর 'গভর্ণর' বিদেশি। উচ্চারণের ইশারায় বর্ণবদল মেনে নেবার ক্ষমতা সব শব্দের একরকম নয়। তৎসম 'সৈন্য' আর অর্ধ-তৎসম 'অভ্যেস' বর্ণবদলে পুরোপুরি অক্ষম। এই মুহূর্তে জবরদস্তি করলে বানান সরল হবার বদলে আরও জটিল হতে পারে। তদ্ভব 'দৈ'-এর ঝোঁক বদলের দিকেই, অবশ্য একটুখানি দ্বিধা নিয়ে। এর ক্ষেত্রে বানানের সরলীকরণ অবাধ নয়, একটা সীমানা মানতেই হয়। দেশি 'ডাঙ্গা' আর বিদেশি 'গভর্ণর' নির্দ্বিধায় সরলীকরণের তত্ত্ব পুরোপুরি মেনে নেয়। এ থেকে আন্দাজ করে নিন, বাংলা শব্দের ভাণ্ডারটি যেহেতু নানারকম শব্দের মিশ্রণে তৈরি, সেইকারণে সরলীকরণের সম্ভাব্যতা আর পদ্ধতিও নানারকমই হবে। অন্ততঃপক্ষে উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণপ্রয়োগের প্রক্রিয়া সব শ্রেণির শব্দ-বানানে যে প্রযোজ্য নয়, এটা বোঝা গেল। উপরের পাঁচটি শব্দে যে দু-তিন রকমের ঝোঁক দেখছি, সাধারণভাবে তা সত্য হলে দেখা যাবে, তৎসম আর অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল, তদ্ভব বানানে সরলীকরণ সম্ভব একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আর দেশি-বিদেশি শব্দের বানানে সরলীকরণ অবাধ।

'সরলীকরণের সীমা' নির্দেশ করতে গিয়ে তিনটি কথা আমরা ব্যবহার করব—'সফল' 'ব্যর্থ' আর 'অংশত সফল'। এই কথা-তিনটে ঠিক কী অর্থে প্রয়োগ করতে হচ্ছে, তা প্রথমেই বুঝে নিন। সেই সঙ্গে বুঝে নিন, সরলীকরণের প্রক্রিয়াটি কী ধরনের। ধরা যাক, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানে সরলীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা ভাবছি। অর্থাৎ, 'শ্রেণী' বানানটিকে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানে কতদূর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, দেখছি। 'শ্রেণী' শব্দের উচ্চারণ 'শ্রেনি'। এর অর্থ, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানটিকে উচ্চারণ-অনুযায়ী 'শ্রেনি'-বানানে পৌঁছতে দু-রকম বর্ণবদল করতে হয়—'ঈ > ই' আর 'ণ > ন'। কিন্তু, তৎসম 'শ্রেণী' বানানকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন থেকে বের করে আনা এই মুহূর্তে অসাধ্য। তাই, ব্যাকরণসম্মত বিকল্প বানানের পথ ধরে 'শ্রেণি' পর্যন্তই এগোনো সম্ভব, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, বর্ণবদলের 'ঈ > ই' ধাপটি পেরোনো গেল (শ্রেণী > শ্রেণি), 'ণ > ন' ধাপটি পেরোনো গেল না। বর্ণবদলের এইরকম এক-একটি ধাপকে আমরা বলব 'সরলীকরণের সূত্র'। এই পাঠে বাংলা শব্দভাণ্ডারের

পাঁচটি শ্রেণি থেকে (তৎসম অর্ধ-তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি) ১১১টি প্রচলিত শব্দ-বানান বেছে নিয়ে তাদের উপর সরলীকরণের ১৯টি সূত্র প্রয়োগ করে দেখব, কোন্ সূত্র কোন্ প্রচলিত বানানে কতটা পরিমাণ সরলীকরণ সম্ভব অথচ গ্রহণযোগ্য করতে পারে। আমরা দেখতে চাই, একটি প্রচলিত বানানে কোনও একটি সূত্র প্রয়োগ করে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত যে বানানটি পাওয়া গেল, তা এখনকার বাংলাভাষার গ্রহণযোগ্য কিনা। যদি তা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সরলীকরণ সেখানে 'সফল'; গ্রহণযোগ্য না হলে সরলীকরণ ব্যর্থ; আর, বানানটিকে সরলীকৃত অথচ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে গিয়ে অংশত উচ্চারণ অনুসারী করা সম্ভব হলে সরলীকরণ হবে 'অংশত সফল।'

এবার দেখুন, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানের সরলীকরণে 'ঈ > ই' সূত্রটি প্রয়োগ করে উচ্চারণ-অনুসারী 'শ্রেণি' বানানটি পাওয়া গেল ('উচ্চারণ-অনুসারী' বলতে এখানে কেবল হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণই বুঝতে হবে)। তৎসম এই বানানটি সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে সহজেই বাংলাভাষাতেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল, 'শ্রেণি' বানানটি আমরা মেনে নিলাম। অতএব, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া (ঈ > ই সূত্রের প্রয়োগ) এখানে সফল'। কিন্তু, এরপর ঐ 'শ্রেণী' বানানটিরই সরলীকরণে 'ণ > ন' সূত্রটি প্রয়োগ করলে তার অন্যরকম ফল উঠে আসবে। সেক্ষেত্রে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত 'শ্রেনি' বানানটি পাব ('উচ্চারণ-অনুসারী' বলতে এখানে কেবল মূর্ধন্য-দন্ত্য উচ্চারণই বুঝব), কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুমোদন না-পাবার কারণে 'শ্রেনি' বানানটি গ্রাহ্য হবে না। সেইকারণে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া (ণ > ন সূত্রের প্রয়োগ) এখানে 'ব্যর্থ'। সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার সফলতা' আর 'ব্যর্থতা' এই নির্দিষ্ট অর্থেই আপনাকে বুঝে নিতে হবে। এবার আর- একটি উদাহরণে বুঝে ন 'অংশত সফল' কথাটির তাৎপর্য। ধরা যাক, প্রচলিত তদ্ভব 'দৈ বানানটিতে 'ঐ > ওই' সূত্রটি প্রয়োগ করে পাওয়া গেল 'দোই' বানানটি। এ বানান উচ্চারণ-অনুসারী নিঃসন্দেহে, কিন্তু একে সরলীকৃত বলব না, বরং ঐ-কার চিহ্নের (ৈ) তুলনায় ও-কার চিহ্নটি (ো) খানিকটা জটিলই। এই ও-কার চিহ্নটিকে সরিয়ে দিয়ে দোই' থেকে 'দই' পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই বানানটি সরল হতে পারে (দৈ > দোই > দই)। 'দই' বানানটি সরল এবং সেইকারণেই গ্রহণযোগ্য, আর পুরোপুরি না হলেও অবশ্যই অংশত উচ্চারণ-অনুসারী। অতএব, ঐ > ওই সূত্রটির প্রয়োগ এখানে ব্যর্থ নয়, পুরোপুরি 'সফল'ও নয়, 'অংশত সফল'।

অতএব, বাংলা শব্দভাণ্ডারের এক-একটি শ্রেণি ধরে ধরে বানান-সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখা যাক, কোন্ শ্রেণির শব্দ-বানানে কতদূর পর্যন্ত সরলীকরণ সম্ভব। দেখা যাক, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া কোথায় 'সফল', কোথায় ব্যর্থ, কোথায় 'অংশত সফল।'

১. তৎসম শব্দ-বানান ঃ

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
ঈ > ই	শ্রেণী	শ্রেনি	শ্রেণি	সফল
	ফণী	ফোনি	ফণী	ব্যর্থ
ঊ > উ	ঊষা	উশা	উষা	সফল
	ঊর্মি	উর্মি	ঊর্মি	ব্যর্থ
ঙ > ং	শঙ্কর	শংকর	শংকর	সফল
	শঙ্কা	শংকা	শঙ্কা	ব্যর্থ
ষ > শ	কোষ	কোশ	কোশ	সফল
	দোষ	দোশ	দোষ	ব্যর্থ
স > শ	সরণী	শরোণি	শরণি	সফল
	সরসী	শরোশি	সরসী	ব্যর্থ
বিসর্গ (ঃ) বর্জন	অন্ততঃ, ক্রমশঃ	অন্তোতো, ক্রমোশো	অন্তত, ক্রমশ	সফল
	দুঃস্থ	দুস্থো	দুস্থ	সফল
	দুঃখ	দুক্‌খো	দুঃখ	ব্যর্থ
রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব > দ্বিত্ব বর্জন	বর্দ্ধমান	বর্ধোমান	বর্ধমান	সফল
যুক্ত ব্যঞ্জনে য-ফলা > য-ফলা বর্জন	দারিদ্র্য, ঈর্ষ্যা	দারিদ্‌দ্রো, ইর্শা	দারিদ্র, ঈর্ষা	সফল

তৎসম শব্দ-বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার যে ছকটি তৈরি হল, তা থেকে এই কটি তথ্য আমরা পেলাম—

১. সরলীকরণের মোট ৮টি সূত্র তৎসম বানানে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেল, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ অংশত সফল। ক্ষেত্রগুলি হল ঈ > ই, ঊ > উ, ঙ > ং, ষ > শ, স > শ আর বিসর্গ-বর্জন। জেনে রাখুন, এসব ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণই বিধান দিয়ে রেখেছে বিকল্প বানানের। বাঙালির কৃতিত্ব কেবল এইটুকু, তাঁরা দুটি বিকল্পের মাঝখান থেকে উচ্চারণ-অনুসারী সরল বানানটিকে বাছাই করে নিতে পেরেছে প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই, এবং এই বাছাই করার কাজটি এসব বানানের সরলীকরণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এবং উপযোগী হয়ে উঠেছে। নইলে দু-রকম বানান-লেখার সমস্যা আরও খানিকটা বেড়েই যেত। নির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্য নিয়েই কথাটা ভেবে নিন। যে ৬টি ক্ষেত্রের কথা উঠল, সেখানকার প্রাসঙ্গিক শব্দ-বানান শ্রেণি, উষা, শংকর, কোশ, শরণি, দুস্থ। এদের ব্যাকরণসম্মত বিকল্প বানান শ্রেণী, ঊষা, শঙ্কর, কোষ, সরণি, দুঃস্থ। বানানে সমতা আনতে গেলে বিকল্পের সুযোগ না রাখাটাই জরুরি হয়ে পড়ে। সেই কারণে, যথাসম্ভব উচ্চারণ-সংগত সরল সহজ বানানটিকে বেছে নিয়ে বিকল্প তৎসম বানানের উচ্ছেদ ঘটানো হল বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে। পরোক্ষে সরলীকরণের কাজটাও মেটানো গেল।

সরলীকরণের এই ৬টি ক্ষেত্রের সফলতাকে 'অংশত' বলার কারণটা এবার ভাবা যাক। লক্ষ করুন, ঈ > ই সূত্রটি ধরে 'শ্রেণি'-তে পৌঁছনো গেল, কিন্তু 'ফণী' থেকে 'ফণি'-তে পৌঁছনো অসাধ্য হল। তেমনি, 'ঊষা' থেকে 'উষা' পেলাম, অথচ 'ঊর্মি'-তে 'উ' বহাল থাকল। একইভাবে 'শঙ্কর' থেকে 'শংকর' স্বাগত, 'শঙ্কা' অবাঞ্ছিত। 'কোষ-সরণি-দুঃস্থ' থেকেও 'কোশ-শরণি-দুস্থ'-তে উত্তীর্ণ হতে ব্যাকরণের ছাড়পত্র মেলে, মেলে না 'দোষ-সরসী-দুঃখ'-এর বেলায়।

২. সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার প্রায় পুরোপুরি সাফল্য কেবল ২টি ক্ষেত্রে—রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনের স্বীকৃতি আর যুক্তবর্ণে অনুচ্চারিত য-ফলার লোপ। এ দুটি ক্ষেত্রেও বিকল্পের বিধান সংস্কৃত ব্যাকরণেরই। আর সেই ব্যাকরণসম্মত বিধানটা কাজে লাগিয়েই সহজ সরল বানানটিকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বানান হিসেবে গণ্য করা হল সরলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অতএব, বাংলা শব্দ-বানানে উঠে এল 'বর্দ্ধমান'-এর জটিল ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব এড়িয়ে সরলীকৃত 'বর্ধমান' আর 'ঈর্ষ্যা'-র যুক্তবর্ণ ('র্ষ') থেকে য-ফলাকে সরিয়ে সরলীকৃত 'ঈর্ষা'। এ সাফল্যকে 'পুরোপুরি' বলার কারণ, রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব আর যুক্তবর্ণের সংলগ্ন য-ফলা তৎসম শব্দের পরিবার থেকে পুরোপুরিই মুছে গেল।

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের প্রত্যাশা মাথায় রেখে তৎসম বানানে সরলীকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায়, বিকল্প বিধানের ফাঁক দিয়ে যেটুকু সাফল্য গড়িয়ে পড়ল 'শ্রেণি' 'উষা' 'শংকর' 'কোশ' 'শরণি' 'দুস্থ' 'বর্ধমান' ঈর্ষা'-র মতো সরলীকৃত বানানে, তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে আরও বেশি মানুষের আরও বেশি শব্দ-লেখায়। ফণী-ঊর্মি-শঙ্কা-দোষ-সরসী-দুঃখ-র মতো অজস্র তৎসম শব্দ, যারা এই মুহূর্তে সরলীকরণের সূত্র অগ্রাহ্য করে বানানে সমতাবিধানের প্রক্রিয়ায় ধরা দিল না, বাংলা লেখায় ক্রমশ তারাও উঠে আসবে সরলীকৃত বাংলা বানানের সুষম মূর্তি নিয়ে।

২. **অর্ধ-তৎসম শব্দ-বানান ঃ**

সরলীকরণের সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
অ > ও	অবিশ্যি, অভ্যেস	ওবিশ্‌শি, ওব্‌ভেশ্‌	অবিশ্যি, অভ্যেস	ব্যর্থ
য > জ	সুয্যি	শুজ্জি	সুয্যি	ব্যর্থ
ণ > ন	গণ্যি, পুণ্যি	গোন্নি, পুন্নি	গন্যি, পুন্যি	সফল
ষ > শ	কেষ্ট, তেষ্টা	কেশ্‌টো, তেশ্‌টা	কেষ্ট, তেষ্টা	ব্যর্থ
স > শ	মিন্‌সে, দস্যি	মিন্‌শে, দোশ্‌শি	মিন্‌সে, দস্যি	ব্যর্থ
ক্ষ > ক্‌খ	সাক্ষি, তক্ষুনি	শাক্‌খি, তোক্‌খুনি	সাক্ষি, তক্ষুনি	ব্যর্থ
জ্ঞ > গ্‌গ	জিজ্ঞেস	জিগ্‌গেশ	জিগ্‌গেস	সফল
য-ফলা > ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব	মিথ্যে, সত্যি	মিথ্যে, শোত্তি	মিথ্যে, সত্যি	ব্যর্থ

অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার ছকটি থেকে পাওয়া তথ্য এইরকম—

১. প্রচলিত অর্ধ-তৎসম বানানে ঈ ঊ ঋ ঐ ঔ নেই, ব-ফলা ম-ফলা নেই, রেফযুক্ত ব্যঞ্জন নেই, (ঃ) নেই, ঙ-ং, ত-ৎ নিয়ে বানান-ভাবুকের মাথাব্যথা নেই। সরলীকরণের ক্ষেত্র এখানে অনেক কম।

২. ৮টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৬টিতেই সরলীকরণ অসাধ্য থাকছে, প্রচলিত বানান বহাল থাকছে।

৩. 'ণ'-কে সরিয়ে 'ন'-কে বসানো পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে, ণ-ন র মধ্য থেকে কোন্‌টি লিখব, এই দ্বিধার সংকট থেকে বানান রক্ষা পেল।

৪. জ্ঞ-বর্ণ থেকে কিছু বানান রেহাই পেলেও বর্ণটির পুরোপুরি উচ্ছেদ হল না। প্রচলিত 'জিজ্ঞেস' ক্রমশ 'জিগ্‌গেস' বানানে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বটে, কিন্তু 'আজ্ঞে' 'অভিজ্ঞ' তাদের অর্ন্তগত জটিল 'জ্ঞ'-বর্ণটিকেই আঁকড়ে রইল, সরলীকরণের সূত্র এদের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

দেখতে পাচ্ছি, প্রচলিত অর্ধ-তৎসম বানানে স্বরবর্ণের প্রয়োগে গোড়া থেকেই তেমন জটিলতা নেই, সরলীকরণ তাই স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। 'অবিশ্যি' 'অভ্যেস' বানানের অ-বর্ণকে সরিয়ে 'ও' বসালেও বানান যথেষ্ট সরল হত না, বরং চেনা শব্দকে অচেনা করে ফেলার দায় লেখকের কাঁধে এসে পড়ত। বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী যে কটি ব্যঞ্জনবর্ণ (ঞ-ণ-য-স-ষ-ঃ-যুক্তব্যঞ্জন), তার মধ্যে ঞ-ঃ অর্ধ-তৎসম বানানে নেই-ই, 'ণ'-কে সরিয়ে 'ন'-কে বহাল করা সম্ভব হয়েছে, যুক্তব্যঞ্জন 'জ্ঞ'-কে অংশত সরানো গেছে, কিন্তু বাকি য-স-ষ-ক্ষ বর্ণগুলির সামনে এসেই সরলীকরণের সূত্র পরাভব মেনে নিচ্ছে। 'ণ' আর 'ষ' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পবিত্রবাবুর অনুযোগ শুনুন—'যে রবীন্দ্রনাথ দন্ত ন-কে মূর্ধন্য ণ-র আসনে বসাতে এত ব্যস্ত ছিলেন, তিনি যে কেন মূর্ধন্য ষ-র জায়গায় বাঙালির নিজস্ব ও স্বাভাবিক তালব্য শ-কে স্থাপনের বিষয়ে এত উদাসীন রইলেন তা ভেবে বিস্ময় লাগে।' আজকের সরলীকরণের সূত্র 'ণ'-কে অতি সহজে বাগে আনলেও 'ষ'-কে ঘায়েল করতে পারছে না, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালি তার অভিমান জানাতেই পারে। তাই বলে রবীন্দ্রহীন একুশ শতক বানানের এই ছোট্ট এলাকাতেও রবীন্দ্র-নির্ভর হয়েই থাকবে, এটা মানতে কষ্ট হয়।

৩. তদ্ভব শব্দ-বানান ঃ

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
অ > ও	ভাল, কাল, মত	ভালো, কালো, মতো	ভালো, কালো, মতো	সফল
	এত, কত, যত	অ্যাতো, কতো, জতো	এত, কত, যত	ব্যর্থ
ঈ > ই	হীরা, সীসা, নীলা পিসী, পাখী, বাড়ী	হিরা, শিশা, নিলা পিশি, পাখি, বাড়ি	হিরা, সিসা, নিলা পিসি, পাখি, বাড়ি	সফল
ঊ > উ	ঊনিশ, চূণ, পূব	উনিশ, চুন, পুব	উনিশ, চুন, পুব	সফল

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
এ > অ্যা	এখন, এমন, কেমন	অ্যাখোন, অ্যামোন ক্যামোন	এখন, এমন কেমন	ব্যর্থ
ঐ > ওই	দৈ, খৈ, বৈ	দোই্, খোই্, বোই্	দই, খই, বই	অংশত সফল
ঔ > ওউ	বৌ, মৌ	বৌউ্, মোউ্	বউ, মউ	অংশত সফল
	নৌকা, চৌপদী	নোউ্কা, চৌউ্পদি	নৌকা, চৌপদী	ব্যর্থ
ঙ > ং	ব্যাঙ, রঙ	ব্যাং, রং	ব্যাং, রং	সফল
ঙ্গ > ঙ	রাঙ্গা, কাঙ্গাল	রাঙা, কাঙাল	রাঙা, কাঙাল	সফল
য > জ	যো, যোগাড়	জো, জোগাড়	জো, জোগাড়	সফল
	যা, যখন	জা, জখোন	যা, যখন	ব্যর্থ
ণ > ন	কাণ, চূণ, সোণা	কান, চুন, শোনা	কান, চুন, সোনা	সফল
ষ > শ	মোষ, ষাঁড়, মানুষ	মোশ, শাঁড়, মানুশ	মোষ, ষাঁড়, মানুষ	ব্যর্থ
স > শ	উপোস, কাঁসা, মাসী	উপোশ, কাঁশা, মাশি	উপোস, কাঁসা, মাসি	ব্যর্থ
ক্ষ > খ	ক্ষুদ, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা	খুদ, খেত, খ্যাপা	খুদ, খেত, খ্যাপা	সফল

এবার দেখা যাক, তদ্ভব বানানের ছক থেকে কী পেলাম—

১. প্রচলিত তদ্ভব বানানে ঋ নেই, য-ফলা ব-ফলা ম-ফলা নেই, রেফযুক্ত ব্যঞ্জন নেই, বিসর্গ নেই, ত-ৎ এর দুর্ভাবনা নেই। তাই, তৎসম-র তুলনায় সরলীকরণের ক্ষেত্র এখানেও বেশ কম।

২. ১৩টি ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল ৩টিতে সরলীকরণ পুরোপুরি বাধা পেল (এ > অ্যা, য > শ, স > শ)।

৩. ৬টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে। এই সফল ক্ষেত্রগুলি হল : ঈ > ই > ঊ > উ, শব্দশেষের ঙ > ং, বিকল্প উচ্চারণে ঙ্গ ঙ, ণ > ন আর শব্দের শুরুতে থাকা ক্ষ > খ। এর ফলটা দাঁড়াল এই—তদ্ভব বানান থেকে দীর্ঘ স্বর (ঈ আর ঊ) মুছে গেল,

ণ-র উচ্ছেদ হল। বেশকিছু শব্দ-বানানে 'ঙ্গ'-র বদলে 'ঙ' আর 'ক্ষ'-র বদলে 'খ' এসে সেসব বানানকে সরল করে তুলল।

৪. ৪টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ অংশত সফল (অ > ও, ঐ > ওই, ঔ > ওউ, য > জ)। ভাল (good)-ভাল (কপাল), কাল(Black)-কাল (সময়), মত (like)-মত (opinion)—প্রচলিত একই বানানের পৃথক শব্দে অর্থের ফারাক বানানের তফাত দিয়ে বোঝানো জরুরি হয়ে উঠছে বলেই এদের কালো-কাল ভালো-ভাল মতো-মত করতে হল। অনাবশ্যক ক্ষেত্রে ও-কার সরলীকরণের সহায়ক নয় বলে এত-কত-তত-যত যেমন ছিল তেমনই থাকল। ঐ আর ঔ দুটিই যৌগিক স্বর, উচ্চারণ অনুযায়ী এদের দুটি করে বর্ণে ভেঙে নিলে তা হবে 'ওই' আর 'ওউ'। কিন্তু এক্ষেত্রেও ও-কারের জটিল চেহারা (ে া) সরলীকরণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই ঐ > অই আর ঔ > অউ পর্যন্ত এগিয়ে দৈ-খৈ-বৌ-মৌ-এর বানানকে যথাসম্ভব সরল করা গেল দই-খই-বউ-মউ-এর চেহারা দিয়ে। 'জাঁতা-জো-জোগাড়'-এর মতো বেশকিছু তদ্ভব শব্দ 'য'-কে সরিয়ে 'জ' মেনে নিল। কিন্তু, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া ব্যর্থ হল 'যে-যখন-যেমন'-এর মতো এমন কিছু শব্দের বানানে, যারা তদ্ভব হয়েও সংস্কৃত উৎস-বানানের দিকেই ঝুঁকে থাকতে চায়।

আমরা দেখলাম, তদ্ভব বানানের যে ১৩-টি ক্ষেত্র যাচাই করা হল, তার মধ্যে ৬টিতে পুরোপুরি আর ৪টিতে অংশত কার্যকর হয়েছে সরলীকরণের সূত্র। দেখা গেল, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর প্রয়োগে তদ্ভব-র ঝোঁক পুরোপুরি হ্রস্ব-র দিকে। এর ফলে ঈ-ঊ তদ্ভব বানান থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হল। 'ণ'-কে তদ্ভব থেকে অনায়াসে সরিয়ে দিল 'ন'। শব্দের প্রথমে 'ক্ষ'-র মতো জটিল অস্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জনও আর রইল না। ঐ-ঔ-ঙ্গ-য বর্ণের প্রয়োগ অনেকটাই কমে গেল। এরই পাশে অনড় হয়ে রইল এ-য-স। কোনও কোনও উচ্চারণে 'অ্যা'-র দাবি জোরদার হলেও (এত-এখন-এমন) 'এ' স্থানচ্যুত হল না। 'শ'-র শক্ত দাবিও নস্যাৎ হল 'য' আর 'স'-এর কাছে (মোষ-মানুষ-ষাঁড়, উপোস-কাঁসা-মাসি)।

শ্রেণি	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
৪. দেশি ঃ	ঈ > ই	চটী	চটি	সফল
	ঙ্গ > ঙ	ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, চোঙ্গা	ডাঙা, ডিঙা ঝিঙা, চোঙা	সফল

শ্রেণি	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
	স > শ	ফরসা, উসখুস, ডাঁসা	ফরসা, উসখুস, ডাঁসা	ব্যর্থ
৫. বিদেশি ঃ	ঈ > ই	ঈগল, ঈদ, কাজী জানুয়ারী, লেডী	ইগল, ইদ, কাজি, জানুয়ারি, লেডি	সফল
	ঋ > রি	খৃস্ট, বৃটিশ	খ্রিস্ট, ব্রিটিশ	সফল
	এ > অ্যা	এসিড	অ্যাসিড	সফল
	ণ > ন	কোরাণ, পরগণা, ইরাণ	কোরান, পরগনা, ইরান	সফল
		গভর্ণর, কর্ণেল	গভর্নর, কর্নেল	
	ষ > শ	পোষাক	পোশাক	সফল
	স > শ	পুলিস, মেসিন, নোটিস	পুলিশ, মেশিন, নোটিশ	সফল
		ফারসি, সাদা, সাবান	ফারসি, সাদা, সাবান	ব্যর্থ
	ক্ষ > ক্খ	মোক্ষম	মোক্ষম	ব্যর্থ
	রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বর্জন	পর্দ্দা, সর্দ্দার, ফর্দ্দ কর্জ্জ, জার্ম্মাণী, গির্জ্জা	পর্দা, সর্দার, ফর্দ কর্জ, জার্মানি, গির্জা	সফল

‘দেশি-বিদেশি বানানের ছক থেকে এটুকু আন্দাজ সহজেই করা যায়, দুটি শ্রেণিই সরলীকরণের সূত্রগুলি সহজেই মেনে নিচ্ছে। তবে, সরলীকরণ দুটি শ্রেণির কাছেই বাধা পাচ্ছে মূলত একটি জায়গায়—স > শ-এর ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে, অন্য সব বর্ণ সরলীকরণের দাবি মেনে নিলেও ‘স’ তার নিজের জায়গাটুকু শ-কে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সেইকারণে, দেশি ফরসা-উসখুস-ডাঁসা বা বিদেশি ফারসি-সাদা-সাবান যেমন ছিল, তেমনি রইল। বিদেশি শব্দ অবশ্য আর-একটি এলাকায় ‘মোক্ষম’ বাধা দিয়েছে সরলীকরণ-প্রক্রিয়াকে। ‘মোক্ষম’ বানানের অর্ন্তগত যুক্তব্যঞ্জন ‘ক্ষ’-কে ভেঙে ‘ক্খ’ করার পক্ষপাতী সে নয়। এটুকু ছেড়ে দিল এককথায় বলা যায়, দেশি-বিদেশি শব্দ-বানানের প্রায় গোটা এলাকায় বানান-সরলীকরণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। এমনকী, উচ্চারণের শক্ত দাবি নিয়েও যে ‘অ্যা’ বর্ণ হিসেবে তদ্ভব শব্দেও মান্যতা পায় নি, বিদেশি শব্দের বানানে ঘটল তার অবাধ অনুপ্রবেশ, অ্যাসিড অ্যান্টেনা অ্যালোপ্যাথি ইত্যাদি বানানে। তৎসম বানানের অন্ধ অনুকরণে ণত্ব-ষত্ব (ইরাণ-কোরাণ গবর্ণর পোষাক) আর রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (পর্দ্দা সর্দ্দার কর্জ্জ জার্ম্মাণ) চলছিল যেসব বিদেশি শব্দের বানানে,

সেসব বানান-ও-সরল সহজ হতে পারল সরলীকরণের সূত্র মেনেই (ইরান কোরান গভর্নর পোশাক পর্দা সর্দার কর্জ জার্মান)।

বানান-সরলীকরণের প্রক্রিয়া, নানা শ্রেণির শব্দ-বানানে তার প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের ব্যর্থতা সফলতা নিয়ে এতক্ষণ কথা হল। সবশুদ্ধ ২১টি সূত্র প্রয়োগ করে ১১১টি শব্দ-বানানে তার ফলাফল দেখা গেল এইরকম—সাফল্য ৬৩টি বানানে, ব্যর্থতা ৪৩টি বানানে আর আংশিক সাফল্য ৫টি বানানে। এবার ঐ ২১টি সূত্র থেকে বেছে নেব কেবল 'অ > ও' সূত্রটিকে। বিশেষ করে এই সূত্রটি নিয়ে বাড়তি যাচাই-এর কারণ, বাঙালির কণ্ঠে বানানের অ-কার বা অ-বর্ণকে ও-ধ্বনিতে উচ্চারণ করার ঝোঁকটা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রতিটি শ্রেণিতে, বাংলা শব্দের প্রতিটি অবস্থানে (শুরুতে মাঝখানে বা শেষে) এর অবাধ বিস্তার। আমাদের বিবেচনার অন্তর্গত ১১১টি শব্দের মধ্য থেকে মোট ২৭টি প্রচলিত শব্দ-বানানের উপর 'অ > ও' সূত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব। করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে মাত্র ৩টি বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া সফল, বাকি ২৪টি ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ। এর অর্থ, প্রচলিত বানানের অর্ন্তগত অ-বর্ণ বা অ-কার (অন্য বর্ণে নিহিত অবস্থায়) উচ্চারণে 'ও' হলেও তেমন উচ্চারণ-অনুসারী বানান এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। উদাহরণগুলি পরপর দেখে নিন—

শ্রেণি	**'অ' এর অবস্থান**	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
তৎসম	শব্দের শুরুতে	ফণী	ফোনি	ফণী	ব্যর্থ
	শব্দের মাঝখানে	সরণী	শরোনি	শরণি	ব্যর্থ
		সরসী	শরোশি	সরসী	ব্যর্থ
		বর্দ্ধমান	বর্ধোমান	বর্ধমান	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	দুঃস্থ	দুস্থো	দুস্থ	ব্যর্থ
		দুঃখ	দুক্‌খো	দুঃখ	ব্যর্থ
		দারিদ্র্য	দারিদ্‌দ্রো	দারিদ্র	ব্যর্থ
অর্ধ-তৎসম	শব্দের শুরুতে	অবিশ্যি	ওবিশ্‌শি	অবিশ্যি	ব্যর্থ
		অভ্যেস	ওব্‌ভেশ্‌	অভ্যেস	ব্যর্থ
		গণ্যি	গোন্নি	গন্নি	ব্যর্থ

শ্রেণি	'অ' এর অবস্থান	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
		দস্যি	দোশ্‌শি	দস্যি	ব্যর্থ
		সত্যি	শোত্তি	সত্যি	ব্যর্থ
		তক্ষুনি	তোক্‌খুনি	তক্ষুনি	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	কেষ্ট	কেশ্‌টো	কেষ্ট	ব্যর্থ
তদ্ভব	শব্দের মাঝখানে	এখন	অ্যাখোন	এখন	ব্যর্থ
		এমন	অ্যামোন	এমন	ব্যর্থ
		কেমন	ক্যামোন	কেমন	ব্যর্থ
		যখন	জখোন	যখন	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	এত	অ্যাতো	এত	ব্যর্থ
		কত	কতো	কত	ব্যর্থ
		যত	জতো	যত	ব্যর্থ
		ভাল	ভালো	ভালো	সফল
		কাল	কালো	কালো	সফল
		মত	মতো	মতো	সফল
দেশি	শব্দের শুরুতে	চটী	চোটি	চটি	ব্যর্থ
বিদেশি	শব্দের শেষে	ফর্দ্দ	ফর্দো	ফর্দ	ব্যর্থ
		কর্জ্জ	কর্জো	কর্জ	ব্যর্থ

দেখা গেল, 'অ > ও' সূত্রের ২৭টি প্রয়োগের ২৪টি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা। কিন্তু এ নিয়ে এই মুহূর্তে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। প্রথমত, তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এ ধরনের বর্ণবদল ব্যাকরণসম্মত নয় বলে গ্রহণযোগ্য হবার পক্ষে বাধা আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি অ-বর্ণ বা অ-কারকে উচ্চারণমুখী ও-কারে বদল করতে গেলে বানান সরল হবার পরিবর্তে জটিল হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। প্রচলিত সরণী-বর্দ্ধমান-দুঃস্থ-দারিদ্র্য যথাসম্ভব সরলীকৃত বানানে শরণি-বর্ধমান-দুস্থ হবার পরও যদি না থামি,

'অ > ও' সূত্র প্রয়োগে আরও বেশি উচ্চারণ-অনুসারী করতে গিয়ে যদি এদের শরোণি-বর্ধোমান-দুস্থো-দারিদ্রো' বানানের জটিল চেহারা এনে দিই, তবে সরলীকরণের মূল উদ্দেশ্যটাই তখন ব্যর্থ হবে। অতএব এসব ক্ষেত্রে বানানের 'অ' লেখায় থাকুক, আর উচ্চারণের 'ও' কণ্ঠে থাকুক, জবরদস্তির দরকার নেই। অবিশ্যি-এমন-চটি-ফর্দ জাতীয় বানানের ক্ষেত্রে একই কথা। তবে, 'ভাল-কাল-মত' থেকে 'ভালো-কালো-মতো' যে গ্রহণযোগ্য সরলীকৃত বানান হিসেবে বিবেচিত হল, তার একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। কপাল অর্থে 'ভাল' আর মন্দ-র বিপরীতে 'ভালো', সময়-অর্থে 'কাল' আর রং বোঝাতে 'কালো', ধারণা-অর্থে 'মত' আর একইরকম বোঝাতে 'মতো'—অর্থের ফারাকটিকে উচ্চারণ দিয়ে ধরিয়ে দেবার রেওয়াজ এতদিন ছিলই। এবার পৃথক বানান দিয়ে সেই কাজটি করার সুযোগ তৈরি হল বলেই 'অ > ও' সূত্রের প্রয়োগ এই তিনটি শব্দ-বানানে (এবং এ-রকম আরও কিছু শব্দ-বানানে) স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া গেল। বাকি ২৪টি শব্দ-বানানে পৃথক অর্থ বোঝানোর দায় নেই, বাস্তবে সরলীকরণও সেসব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠছে না। সেই কারণে 'অ > ও' সূত্রের প্রয়োগ সেখানে ব্যর্থ হল।

১১৫.৪.১ সারাংশ—২

বানানকে যথাসাধ্য সরল করাই যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, সেই কারণে উচ্চারণ মেনে বানান-লেখা ততক্ষণই চলবে, যতক্ষণ তা আরও সহজ হবে। এটা করতে গিয়ে দেখতে পাবেন, উচ্চারণ অনুসারে বর্ণবদল মেনে নেবার ক্ষমতা এক-এক শ্রেণির শব্দের এক-একরকম। তৎসম 'সৈন্য' বা অর্ধ-তৎসম 'অভ্যেস' উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণবদল মানবে না, করতে গেলে বানান আরও জটিল হবে (শোইন্নো, ওব্‌ভেশ), তদ্ভব 'দৈ' বর্ণবদল মানবে 'দই' পর্যন্ত ('দোই' চলবে না), দেশি 'ডাঙ্গা' আর বিদেশি 'গভর্ণর' অবাধে মেনে নেবে 'ডাঙা' আর গভর্নর'-এর বদলে-যাওয়া বানান। অর্থাৎ সাধারণভাবে ধরে নিন, তৎসম আর অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল, তদ্ভব বানানে সরলীকরণ সম্ভব একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে, দেশি-বিদেশি বানানে সরলীকরণ অনেকটাই অবাধ।

১৭টি তৎসম শব্দে সরলীকরণের সূত্র প্রয়োগ করে দেখা গেল—৬টি শব্দ প্রচলিত বানান বহাল রাখছে ১১টি শব্দে সরলীকরণ সফল হচ্ছে বিকল্প বানানের সুযোগে। তবে, বিকল্প বিধানের ফাঁক দিয়ে শ্রেণি-উষা-শংকর-কোণ-শরণি-অন্তত-দুস্থ-ঈর্ষা বানানের এই সরলীকৃত চেহারা তৎসম বানানের সরলীকরণের সীমানাকে ক্রমশ বাড়িয়ে দেবে, এটা আশা করা যায়।

১৪টি অর্ধ-তৎসম শব্দের ১১টিতেই সরলীকরণ ব্যর্থ, প্রচলিত বানান বহাল। বাকি ৩টি ক্ষেত্রে 'ণ'-র বদলে 'ন' (গণ্যি > গন্নি) বা 'জ্ঞ'-র বদলে 'গ্‌গ' (জিজ্ঞেস > জিগ্‌গেস)—এইটুকু বর্ণবদলে সরলীকরণের সাফল্য দেখা যাচ্ছে।

তদ্ভব বানানের ১৩টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ-সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে ৬টিতে পুরোপুরি আর ৪টিতে অংশত সাফল্য পাওয়া গেল, ব্যর্থতা ৩টিতে। অর্থাৎ, তদ্ভব বানানের ঝোঁক সরল হবার দিকে, তবু দ্বিধা থাকছে অনেকটাই। সরলীকরণের বিরুদ্ধে অনড় হয়ে থাকছে এ-য-স। দেশি-বিদেশি শব্দে সরলীকরণ প্রায় পুরোপুরিই সফল। উচ্চারণ মেনে বর্ণবদলে প্রায় সব শব্দই আগ্রহী। বাধা আসে কেবল 'স' (দেশি ফরসা-উসখুস-ডাঁসা, বিদেশি ফারসি-সাদা-সাবান) আর 'ক্ষ' (মোক্ষম)-এর তরফ থেকে।

১১৫.৪.২ অনুশীলনী-২

১. তৎসম অর্ধ-তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি শব্দের বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া কতদূর প্রযোজ্য, উদাহরণসহ দেখিয়ে দিন।

২. (ক) সূত্র উল্লেখসহ নীচের প্রচলিত বানানগুলির সরলীকরণ করুন—ঊষা, শঙ্কর, কোষ, সরণী, ক্রমশঃ, বর্দ্ধমান, দারিদ্র্য, ঊর্ব্বশী, শুভঙ্কর, পরিবেষণ, অন্ততঃপক্ষে ঊর্দ্ধ, ভ্রুকুটী, বৈশিষ্ট্য, পুণ্যি, জিজ্ঞেস, মফঃসল, হিস্যা, খৃষ্টাব্দ, সর্দ্দার, ঊনিশ, বৌ, ক্ষ্যাপা, এসিড, লস্যি, পোষাক, গভর্ণর, পুলিস, ব্যানার্জ্জি, চতুর্দ্দিক্।

(খ) সূত্র উল্লেখসহ নীচের প্রচলিত বানানগুলি থেকে সরলীকরণযোগ্য বানান বাছাই করে যথাসম্ভব সরলীকরণ করুন—

ঈদ, মোক্ষম, কোরাণ, ফরাসী, ডিঙ্গা, দাঙ্গা, রাঙ্গা, কোষ, দোষ, মোষ, মৌ, নৌকা, মৌলবী, মৌলানা, কোণাকুণি, গণ্য, দুঃস্থ, দুঃখ, অতঃপর, ঋষি, ঋক্‌থ, ঊর্ম্মি, ঊষা, শ্রেণী, ফণী, বেণী, ননী, সরসী।

(গ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে ২টি করে প্রচলিত বানানের সরলীকরণ করুন—
ঋ > রি ঙ > ং ক্ষ > খ জ্ঞ > গ্‌গ ঐ > অই
এ > অ্যা য > শ ঈ > ই ণ > ন স > শ।

১১৫.৫ মূলপাঠ—৩ ঃ সরলীকরণের উদাহরণ

এর আগের দুটি মূলপাঠে সরলীকরণের ভাবনা আর প্রয়োগের কিছু নমুনা দেখতে পেলেন। সেইসঙ্গে এও দেখলেও, সরলীকরণ বাংলা বানানের সবক্ষেত্রেই অবাধ নয়, সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে এর নির্দিষ্ট কিছু বাধা আছে, আর সেই কারণে এ প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও মেনে নিতে হচ্ছে। সময় যত এগোবে, গ্রহণীয়তার পরিধিও তত বাড়বে। বানান সরলীকরণের এখনকার সীমানা আন্দাজ করার জন্য কিছু কিছু উদাহরণ এই মূলপাঠে তুলে ধরা হচ্ছে।

বানান সরলীকরণের প্রক্রিয়া থেকে এটা অবশ্যই দেখতে পাবেন, বেশির ভাগ প্রচলিত বানানই বদল চায় না, কেননা, উচ্চারণ-অনুসারী বদলে তার চেনা চেহারাটি সরল না হয়ে আরও জটিল হতে পারে। এই সম্ভাবনাটি তৎসম আর অর্ধ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই বেশি, তদ্ভব-দেশি-বিদেশির ক্ষেত্রে তুলনায় কম। সরলীকরণের অংশ নিতে চায় যেসব শব্দ, তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব—

১. উচ্চারণ-অনুসারী সরলকীকৃত বানান পুরোপুরি মেনে নেয় এমন শব্দ;

২. প্রচলিত বানান বজায় রেখে বিকল্পে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত বানান মেনে নেয় এমন শব্দ;

৩. নিজেরা উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত বানান পুরোপুরি মেনে নিলেও একই শ্রেণির বা একই গোত্রের অন্য কিছু শব্দকে ব্যতিক্রম হিসেবে এ প্রক্রিয়ার বাইরে ঠেলে দেয় এমন শব্দ।

ভাগ-১ এর উদাহরণ তৎসম অর্চনা কর্ম সূর্য, অ-তৎসম ফর্দ আর্মানি গির্জা—এইরকম রেফযুক্ত শব্দ, যারা রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কাটিয়ে এখন একক ব্যঞ্জনকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে। ভাগ-২-এর উদাহরণ তৎসম দেশি-দেশী ঋক্থ-রিক্থ, অ-তৎসম বৈঠা-বইঠা, যুঁই-জুঁই সড়াত-সড়াৎ ব্যাংক-ব্যাঙ্ক-এর মতো কিছু জোড়া বানানের শব্দ, যারা 'এক শব্দ এক বানান' লক্ষ্যের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেও থমকে দাঁড়িয়েছে 'এক শব্দ দুই বানান'-এর শক্ত দেয়ালটার সামনে। ভাগ-৩-এর উদাহরণ পদবি উষা অহংকার কোশ শরণি—এইরকম কিছু তৎসম শব্দ, যারা ই-ঈ, উ-ঊ, ঙ-ং, য-শ, স-শ-এর দ্বিধায় দোল খেতে খেতে ক্রমশ সরলীকৃত বানানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। কিন্তু এদের পাশে ব্যাকরণের শক্ত শাসন মেনে প্রচলিত বানানে আটকে রইল আরও অজস্র শব্দ (ফণী মাধবী ঊর্মি অঙ্ক ভঙ্গ দোষ সরসী ইত্যাদি), যারা এদেরই সগোত্র। ভাগ-৩ এর আরও উদাহরণ আরবি-ইংরেজি-জাপানি-তুরকি-ফরাসির মতো অ-তৎসম শব্দ, যারা অবাধে ঈ-কারের ফাঁস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে ই-কারকে বরণ

করে নিলেও তাদেরই সগোত্র অস্ট্রেলীয়-ইতালীয়-কানাডীয় কেবল তৎসম 'ঈয়' প্রত্যয় মেনে নেবার দোষে ঈ-কার থেকে রেহাই পেল না। একইভাবে তৎসম অন্তত-ক্রমশ-দুস্থ বিসর্গের বাঁধন কেটে বেরিয়ে এলেও অতঃপর-মনঃপূত-দুঃখ বানানে বিসর্গ বহাল থাকলই।

সরলীকৃত বানানের যে তিনটি ভাগের কথা বলা হল, তার মধ্যে ভাগ-১ এর অর্ন্তগত হবে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব অমান্য করার প্রতিটি উদাহরণ, সেইসঙ্গে থাকবে 'ণ'-র বদলে 'ন' আর 'ঋ' র বদলে 'রি'কে মেনে নেবার আরও কিছু উদাহরণ। ভাগ-২ এর উদাহরণে দেখা যাবে সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি প্রচলিত বানানকে বিকল্প হিসেবে মেনে নেবার কারণে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার একধরনের সীমাবদ্ধতা, ভাগ-৩ এর উদাহরণে পাবেন সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু কিছু প্রচলিত বানানকে মেনে নেবার কারণে সরলীকরণের আর-এক ধরনের সীমাবদ্ধতা।

এবারে আমরা একটি একটি করে প্রতিটি ভাগের কিছু কিছু উদাহরণকে তালিকাবদ্ধ করার দিকে এগোই—

ভাগ-১. বাংলা বানানের সার্বিক সরলীকরণ

ক. তৎসম শব্দ ঃ

সরলীকরণের সূত্র ঃ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন

প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
অর্চ্চনা	অর্চনা	গর্জ্জন	গর্জন
অর্জ্জন	অর্জন	গর্ব্ব	গর্ব
অর্জ্জুন	অর্জুন	ঘর্ম্ম	ঘর্ম
অর্দ্ধ	অর্ধ	চর্চ্চা	চর্চা
অর্ব্বাচীন	অর্বাচীন	চর্ব্বণ	চর্বণ
আর্ত্ত	আর্ত	চর্ম্ম	চর্ম
আর্য্য	আর্য	চর্য্যা	চর্যা
আবর্ত্ত	আবর্ত	জর্জ্জরিত	জর্জরিত
ঊর্দ্ধ	ঊর্ধ্ব	তর্জ্জন	তর্জন
ঊর্ব্বর	উর্বর	তূর্য্য	তুর্য
ঊর্ম্মি	ঊর্মি	দুর্দ্দম	দুর্দম

প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
ঊর্ম্মিলা	ঊর্মিলা	দুর্দ্দশা	দুর্দশা
ঐশ্বর্য্য	ঐশ্বর্য	দুর্দ্দিন	দুর্দিন
কর্ত্তব্য	কর্তব্য	দুর্দ্দৈব	দুর্দৈব
কর্ত্তা	কর্তা	দূর্ব্বা	দূর্বা
কর্ম্ম	কর্ম	দুর্ব্বোধ	দুর্বোধ
কার্ত্তিক	কার্তিক	দুর্ম্মতি	দুর্মতি
খর্ব্ব	খর্ব	দুর্য্যোগ	দুর্যোগ
ধূর্ত্ত	ধূর্ত	বর্ব্বর	বর্বর
ধৈর্য্য	ধৈর্য	বার্দ্ধক্য	বার্ধক্য
নর্ত্তক	নর্তক	বীর্য্য	বীর্য
নর্ম্মদা	নর্মদা	ভর্ত্তা	ভর্তা
নির্জ্জন	নির্জন	ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য
নির্দ্দয়	নির্দয়	মর্ম্ম	মর্ম
নির্ব্বাক	নির্বাক	মর্ত্ত	মর্ত
নির্ব্বাচন	নির্বাচন	মর্য্যাদা	মর্যাদা
নির্ব্বাধ	নির্বাধ	মূর্ত্তি	মূর্তি
নির্ব্বোধ	নির্বোধ	মূর্চ্ছনা	মূছনা
পর্ব্ব	পর্ব	শর্ত্ত	শর্ত
পর্য্যটন	পর্যটন	শর্ম্মা	শর্মা
পূর্ব্ব	পূর্ব	শৌর্য্য	শৌর্য্য
বর্জ্জন	বর্জন	সর্ব্ব	সর্ব
বর্ত্তমান	বর্তমান	সূর্য্য	সূর্য
বর্দ্ধমান	বর্ধমান	হর্ম্ম্য	হর্ম্য

খ. অ-তৎসম শব্দ ঃ

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
১. রেফের নীচে	আর্দ্দালী	আর্দালি
ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন	আর্ম্মানী	আর্মানি
	উর্দ্দি	উর্দি
	উর্দ্দু	উর্দু
	গর্দ্দান	গর্দান
	চার্জ্জ	চার্জ
	চ্যাটার্জ্জি	চ্যাটার্জি
	জর্দ্দা	জর্দা
	জর্জ্জ	জর্জ
	জার্ম্মাণ	জার্মান
	পর্দ্দা	পর্দা
	ব্যানার্জ্জি	ব্যানার্জি
	মুখার্জ্জি	মুখার্জি
	সর্দ্দার	সর্দার
২. ঋ > রি	খৃষ্টান	খ্রিস্টান
	খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
	বৃটিশ	ব্রিটিশ
	বৃটেন	ব্রিটেন
৩. ণ > ন	অঘ্রাণ	অঘ্রান
	কাণ	কান
	চুণ	চুন
	ঝরণা	ঝরনা
	ঠাকরুণ	ঠাকরুন

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
	দরুণ	দরুন
	পুরাণ	পুরোনো
	রাণী	রানি
	সোণা	সোনা
	প্যাণ্ট	প্যান্ট
	লণ্ঠন	লন্ঠন
	ঠাণ্ডা	ঠান্ডা

ভাগ-২. বানান-সরলীকরণের সীমা ঃ বিকল্প প্রচলিত বানান পাশাপাশি

	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান/গৃহীত বানান
তৎসম শব্দ ঃ	ঈ > ই	দেশী	দেশি, দেশী
	ঋ > রি	ঋ ক্থ	রিক্থ, ঋক্থ
অর্ধ-তৎসম শব্দ ঃ	ঊ > উ	ঊনত্রিশ	উনতিরিশ, ঊনত্রিশ
	য > জ	ভটাচায্যি	ভটচাজ্জি, ভটচায্যি
তদ্ভব শব্দ ঃ	অ > ও	বড়	বড়ো, বড়
		কোন	কোনো, কোনও
	ঐ > অই	বৈঠা	বইঠা, বৈঠা
	ঔ > অউ	চৌকো	চউকো, চৌকো
		চৌকি	চউকি, চৌকি
		মৌমাছি	মউমাছি, মৌমাছি
	য > জ	যুঁই	জুঁই, যুঁই
	স > শ	সজারু	শজারু, সজারু
দেশি শব্দ ঃ	ঈ > ই	কাহিনী	কাহিনি, কাহিনী
	এ > অ্যা	ভেংচানো	ভ্যাংচানো, ভেংচানো
	অ > ও	সড়গড়	সড়োগড়ো, সড়গড়

	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান/গৃহীত বানান
	ৎ > ত	সড়াৎ	সড়াত, সড়াৎ
		ধ্যাৎ	ধ্যাত, ধ্যাৎ
বিদেশি শব্দ ঃ	ঈ > ই	ঈদ	ইদ, ঈদ
		চীনা	চিনা, চীনা
	এ > অ্যা	খেসারত	খ্যাসারত, খেসারত
	অ > ও	পর্তুগীজ	পোর্তুগিজ, পর্তুগিজ
		পরটা	পরোটা, পরটা
	ঙ > ং	ব্যাঙ্ক	ব্যাংক, ব্যাঙ্ক
	য > জ	যিশু	জিশু, যিশু

ভাগ-৩, বানান-সরলীকরণের সীমা ঃ ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান পাশাপাশি

'আকাদেমি বানান অভিধানে'র পরিশিষ্ট-৩-এ (তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০১) ৩৩০টি **তৎসম** শব্দের একটি বর্ণাক্রমিক তালিকা দেখতে পাবেন। তালিকাভুক্ত প্রতিটি শব্দেরই একাধিক ব্যাকরণসম্মত বানান পাশাপাশি দেওয়া আছে। প্রতিটি জোড়া বানানের প্রথমটি আজকের বাংলাভাষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য আকাদেমি-সমর্থিত বানান, দ্বিতীয়টি প্রচলিত কিন্তু বর্জনীয় বানান। ঐ তালিকা থেকে কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল, লক্ষ করুন—

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
১. ঈ > ই	অঙ্গুলী	অঙ্গুলি
	অন্তরীক্ষ	অন্তরিক্ষ
	আবীর	আবির
	উত্তরসূরী	উত্তরসূরি
	কুটীর	কুটির
	চীৎকার	চিৎকার
	ঝিল্লী	ঝিল্লি
	তুলী	তুলি
	পদবী	পদবি

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
	পদাবলী	পদাবলি
	পল্লী	পল্লি
	দেবী	দেবি
	ভঙ্গী	ভঙ্গি
	শ্রেণী	শ্রেণি
	সূচী	সূচি
২. ঊ > উ	আকূতি	আকুতি
	ঊর্ণা	উর্ণা
	ঊর্বর	উর্বর
	ঊর্বশী	উর্বশী
	ঊষা	উষা
	ভূ	ভু
৩. ঙ > ং	অলঙ্কার	অলংকার
	অহঙ্কার	অহংকার
	ওঙ্কার	ওংকার
	কিঙ্কর	কিংকর
	কিঙ্কিণি	কিংকিণি
	ঝঙ্কার	ঝংকার
	টঙ্কার	টংকার
	প্রলয়ঙ্কর	প্রলয়ংকর
	শুভঙ্কর	শুভংকর
	সঙ্কলন	সংকলন
	সঙ্কীর্তন	সংকীর্তন
	সঙ্কেত	সংকেত

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
	সঙ্গত	সংগত
	সঙ্গীত	সংগীত
	সঙ্ঘ	সংঘ
	সঙ্ঘাত	সংঘাত
	হুঙ্কার	হুংকার
	হৃদয়ঙ্গম	হৃদয়ংগম
৪. ষ > শ	কোষ	কোশ
৫. স > শ	কিসলয়	কিশলয়
৬. য-ফলা > য-ফলা বর্জন	ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা
	উপলক্ষ্য	উপলক্ষ
	দারিদ্র্য	দারিদ্র
৭. ঃ > বিসর্গ বর্জন	দুঃস্থ	দুস্থ
	নিঃশ্বাস	নিশ্বাস
	নিঃস্পৃহ	নিস্পৃহ
	নিঃস্পন্দ	নিস্পন্দ
	বক্ষঃস্থল	বক্ষস্থল

সরলীকরণের ৭টি সূত্র প্রয়োগ করে উপরের ৫০টি তৎসম শব্দের বানানে, সব মিলিয়ে তালিকাবদ্ধ ৩৩০টি বানানেই সরলীকরণ করা সম্ভব। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই কটি শব্দের জন্য বিকল্প বানানের বিধান রয়েছে বলেই এটা সম্ভব হল। কিন্তু, এই ছোট্ট তালিকার বাইরে যে অসংখ্য তৎসম বানান প্রচলিত রয়েছে, সরলীকরণের সূত্র তাদের সবার কাছে পৌঁছতেই পারছে না। দেখা যাক, প্রচলিত তৎসম বানানে সরলীকরণ আর কতটা সম্ভব।

উপরের ৭নং সূত্রে দুঃস্থ-নিঃশ্বাস-নিঃস্পৃহ-নিঃস্পন্দ-বক্ষঃস্থল থেকে মাঝখানে থাকা বিসর্গকে মুছে যেতে দেখেছেন, এবং এটা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান মেনেই ঘটছে। কিন্তু, অতঃপর-মনঃপূত-দুঃখ বানান তাদের মাঝখানটার বিসর্গ-কে বহাল রাখছে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের বেড়া ডিঙিয়ে সরলীকরণের

আরও জোরদার একটি সূত্রের সহায়তায় শব্দের শেষে-থাকা বিসর্গকে সহজেই সরিয়ে দেওয়া গেছে অন্ততঃ-প্রথমতঃ-ফলতঃ-বস্তুতঃ-ক্রমশঃ-প্রায়শঃ থেকে, পাওয়া গেছে বিসর্গহীন অন্তত-প্রথমত-ফলত-বস্তুত-ক্রমশ-প্রায়শ।

৩নং সূত্র প্রয়োগ করে অলংকার-সংগীত-সংঘাতের মতো ঙ-হীন সরলীকৃত কিছু-সংখ্যক বানান আমাদের হাতে এলেও অঙ্ক-শঙ্খ-বঙ্গ-জঙ্ঘা এবং এই রকমের ঙ-যুক্ত বেশ কিছু শব্দই প্রচলিত বানান আঁকড়ে থেকে গেল।

এবারে ঐ ৭টি সূত্রের বাইরে আরও একটি সূত্র প্রয়োগ করা যাক হস্-যুক্ত বানানের উপর। শব্দের শেষে-থাকা হস্‌চিহ্ন-বর্জনের এই উদ্যোগে আশিস্-দিক্-ধিক্-পরিষদ্-বণিক্ বা শ্রীমান্-জ্ঞানবান্-ভগবান্-এর মতো কিছু শব্দ হস্‌চিহ্নহীন আশিস-দিক-ধিক-পরিষদ-বণিক বা শ্রীমান-জ্ঞানবান-ভগবান বানানেই আজকের বানানভাবুকদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। তবু, সরলীকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রইল সন্ধিজাত শব্দের মাঝখানে থাকা হস্‌চিহ্নের দাবিদার বানান দিগ্‌ভ্রান্ত-পৃথক্‌করণ-বাগ্‌ধারা।

অতএব, এটা বোঝা গেল, বাংলা শব্দের ভাণ্ডারে যে অজস্র পরিমাণ তৎসম শব্দ রয়েছে, তার মধ্য থেকে গুটিকতক শব্দের বানানেই সরলীকরণ সম্ভব। কেননা, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধিনিয়মের চৌহদ্দির বাইরে তাদের টেনে আনা এই মুহূর্তে অসাধ্য। তৎসম বানানের ক্ষেত্রে সরলীকরণের এই সীমাবদ্ধতা আপাতত মানতেই হবে।

অ-তৎসম বানানে সরলীকরণের সূত্র কতটা সফল হতে পারে, 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি'-র (আকাদেমি বানান অভিধান ঃ পরিশিষ্ট -১) পথ ধরে দেখা যাক।

সরলীকরণের সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**গ্রহণযোগ্য বানান**
১. ঈ > ই	কুমীর-দিঘী-পাখী-বাড়ী	কুমির-দিঘি-পাখি-বাড়ি
	বাঁশী-হাতী-হীরা-পশমী	বাঁশি-হাতি-হিরা-পশমি
	কাকী-খুকী-পিসী-মামী	কাকি-খুকি-পিসি-মামি
	বাঘিনী-বামনী-ছুঁড়ী-রাণী	বাঘিনি-বামনি-ছুঁড়ি-রানি
	জমিদারী-ডাক্তারী-পণ্ডিতী	জমিদারি-ডাক্তারি-পণ্ডিতি
	মারাঠী-মৈথিলী-হিন্দী	মারাঠি-মৈথিলি-হিন্দি
	অসমীয়া-ওড়িশী-বাঙালী	অসমিয়া-ওড়িশি-বাঙালি

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য বানান
	দরদী-সরকারী-জানুয়ারী	দরদি-সরকারি-জানুয়ারি
	গোলামী-চালাকী-কেরামতী	গোলামি-চালাকি-কেরামতি
	ঢাকী-মালী-কাঁসারী	ঢাকি-মালি-কাঁসারি
ব্যতিক্রম ঃ	অস্ট্রেলীয়-ইতালীয়-কানাডীয়	
	ইউরোপীয়-এশীয়-জর্জীয়	
	(-ঈয় প্রত্যয়ের জোরে)	
২. ঊ > উ	ধূলা-পূরা-ঊনিশ	ধুলো-পুরো-উনিশ
ব্যতিক্রম	ঊনত্রিশ-মুর্খামি-ভূতুড়ে-পূজারি	
	(তৎসম উপসর্গ বা তৎসম শব্দের জোরে)	
৩. অ > ও	কাল-ভাল-এগার-বার	কালো-ভালো-এগার-বার
	তের-চোদ্দ-পনের	তেরো-চোদ্দো-পনেরো
	ত-হয়ত-মত	তো-হয়তো-মতো
ব্যতিক্রম ঃ	এত-কত-তত-যত	
৪. ঐ > অই ঃ	কৈ-খৈ-থৈ-দৈ	কই-খই-থই-দই
	পৈতে-হৈচৈ-থৈথৈ	পইতে-হইচই-থইথই
ব্যতিক্রম ঃ	কৈফিয়ত-তৈরি-নৈবিদ্যি-বৈঠক	
৫. ঔ > অউ ঃ	মৌ-বৌ-ফৌজ-মৌজ-মৌলবী	মউ-বউ-ফউজ-মউজ-মউলবি
ব্যতিক্রম ঃ	মৌজা-মৌলানা-কৌটা	
	দৌড়-মৌরি-পৌনে-চৌঠা	

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য বানান
৬. ঙ্গ > ঙ	ভাঙ্গা-কাঙ্গাল-গ্যেঙ্গানি-ঝিঙ্গা	ভাঙা-কাঙাল-গোঙানি-ঝিঙা
	ড্যাঙ্গা-ডিঙ্গি-ঢ্যাঙ্গা-রাঙ্গা	ডাঙা-ডিঙি-ঢ্যাঙা-রাঙা
	লাঙ্গল-রঙ্গীন-নোঙ্গর-ধাঙ্গর	লাঙল-রঙিন-নোঙর-ধাঙর
ব্যতিক্রম ঃ	জঙ্গুলে-জঙ্গি-লুঙ্গি-হাঙ্গামা	('ঙ্গ' উচ্চারণের জোরে)
৭. য > জ	যাঁতি-যাঁতা-যুতসই	জাঁতি-জাঁতা-জুতসই
	যো-যোগাড়-যোড়া-যোড়	জো-জোগাড়-জোড়া-জোড়
ব্যতিক্রম ঃ	যখন-যদ-যন্তর-যাওয়া-যিনি (প্রচলনের জোরে)	
৮. ক্ষ > খ	ক্ষুদ-ক্ষেত-ক্ষ্যাপা	খুদ-খেত-খ্যাপা
ব্যতিক্রম ঃ	মোক্ষম, তক্ষুনি (প্রচলনের জোরে)	
৯. য-ফলা > ব্যঞ্জন দ্বিত্ব	হিস্যা-লস্যি	হিস্সা-লস্সি
ব্যতিক্রম ঃ	কাব্যি-মান্যি-গণ্যি	
১০. স > শ	আপাসোস-তহসিল	আপশোশ-তহশিল
	নোটিশ-মেসিন	নোটিশ-পালিশ
ব্যতিক্রম ঃ	সাবান-সাদা-জিনিস (প্রচলনের জোরে)	

উপরে যে ১০টি সূত্র প্রয়োগ করা হল, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু বানান যেমন সরলীকৃত হল, কিছু বানান তেমনি এসব সূত্র এড়িয়ে ব্যতিক্রম হিসেবেই প্রচলিত চেহারা নিয়ে পড়ে রইল। সরলীকরণের প্রক্রিয়া এসব শব্দ-বানানের কাছে এসে ব্যর্থ। সেইসঙ্গে অসম্পূর্ণ থেকে গেল বানানে সমতাবিধানের উদ্যোগ।

১৯৩৬-৩৭ এর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২-দফা বানানের নিয়ম আর ১৯৯৭-২০০১ এর বাংলা আকাদেমির ২০-দফা বানানবিধি—এই দুবারের দুই কিস্তি নির্দেশ-নামা থেকে একটি বিষয় বোঝা গেল, অ-তৎসম বানান থেকে 'ঋ' আর 'ণ' মুছে দেওয়া আর সব রকমের বানান থেকে রেফযুক্ত ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বর্জন করার নির্দেশে কোনও ব্যতিক্রম নেই, বিকল্পের ব্যবস্থা নেই। অন্য সব বিধানেই প্রচলিত বানানকে

অন্ততপক্ষে অংশত বাঁচিয়ে রাখার মতো কোনও-না-কোনও রকম ফাঁক থাকছেই, যা গলিয়ে অনেক বানান সমতাবিধানের মূল শর্তকে অমান্য করতে পারছে এখনও পর্যন্ত। অথচ, সেসব বিকল্প বা ব্যতিক্রম না মেনে নিয়েও এখনই কোনও উপায় বানান-ভাবুকদের হাতে নেই। বানান-সরলীকরণের সীমাবদ্ধতা এখানেই। সীমানাটা মানতে হচ্ছে বলেই 'দেশি'র পাশে 'দেশী' বা 'বইঠা'র পাশে 'বৈঠা' সমান প্রশ্রয়ে বহাল থাকছে, আশিস-বিপদ-ভগবান হস্‌মুক্ত হলেও পৃথক্‌করণ-বাগ্‌দেবী-দিক্‌ভ্রান্ত বানানে হস্‌চিহ্ন থাকছেই, অনুজ্ঞায় বলো-বোলো-হোক ও-কার পেলেও বলল-বলব-বলত প্রচলিত বানানেই আটকে পড়ছে, 'হিস্যা' থেকে 'হিস্‌সা' বা 'লস্যি' থেকে 'লস্‌সি' হলেও 'কাব্যি' থেকে 'কাব্বি' বা মান্যিগন্যি থেকে 'মান্নিগন্নি' হতে পারছে না।

১১৫.৫.১ সারাংশ—৩

বাংলা বানানে সমতা আনতে গিয়ে 'এক শব্দ এক বানান' নীতির দিকে এগোতে গিয়ে—অর্থাৎ বানানে সরলীকরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, সরলীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসছে তিন রকমের শব্দ। কিছু শব্দ উচ্চারণ-মুখী বানান পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে, কিছু শব্দ উচ্চারণ-মুখী সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি প্রচলিত বানানকেও বিকল্প হিসেবে রেখে দিচ্ছে, আর কিছু শব্দ সরলীকরণে এগিয়ে এলেও একই গোত্রের অন্য কিছু শব্দ ব্যতিক্রম হিসেবে প্রচলিত বানানেই থেকে যাচ্ছে। প্রথম ভাগের শব্দ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ পুরোপুরি বর্জন করে (অর্চনা-গর্ব-সূর্য, জর্দা-জার্মান-জর্জ), অ-তৎসম শব্দ 'ণ'-র বদলে 'ন' আর 'ঋ'-র বদলে 'রি' মেনে নেয় ('কাণ-সোণা-রাণী'র বদলে 'কান-সোনা-রানি', 'খৃষ্টান-বৃটিশ-বৃটেন'-র বদলে 'খ্রিস্টান-ব্রিটিশ-ব্রিটেন')। দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ সরলীকৃত 'দেশি'র পাশে প্রচলিত 'দেশী', রিক্‌থ'-র পাশে 'ঋক্‌থ', এইরকম— উনতিরিশ-ঊনত্রিশ, চউকো-চৌকো, জুঁই-যুঁই, কাহিনি-কাহিনী, খ্যাসারত-খেসারত, ব্যাংক-ব্যাঙ্ক। তৃতীয় ভাগে প্রচলিত তৎসম শব্দ 'ঝিল্লী-ভঙ্গী-শ্রেণী-পদাবলী' সরলীকৃত হয়ে 'ঝিল্লি-ভঙ্গি-শ্রেণি-পদাবলি' হলেও 'প্রতিযোগী-মায়াবী-পৃথিবী' শেষের ঈ-কার নিয়ে প্রচলিত বানানেই থেকে গেল। একইভাবে, 'আকৃতি-ঊর্ণা-ভ্রূ' থেকে 'আকুতি-উর্ণা-ভ্রু 'ঊষা-প্রত্যুষ' হল, ব্যতিক্রম হয়ে রইল 'শূন্য-পূর্ণ-দূর-পূরণ'; 'অলঙ্কার-ঝঙ্কার-সঙ্গীত-সঙ্ঘাত' থেকে 'অলংকার-ঝংকার-সংগীত-সংঘাত' গৃহীত হল সরলীকৃত বানান নিয়ে, ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানানেই আত্মরক্ষা করতে হল 'অঙ্ক-শঙ্খ-বঙ্গ-জঙ্ঘা-বঙ্কিম'-কে। অ-তৎসম 'কুমীর-জমিদারী-দরদী-গোলামী-মালী' শেষের ঈ-কার ছেড়ে 'কুমির-জমিদার-দরদি-গোলামি-মালি' হতে পারল, 'অস্ট্রেলীয়-কানাডীয়-ইউরোপীয়' বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল প্রচলিত বানানে। এমনকী, 'কৈ-খৈ-দৈ' অনায়াসে 'কই-খই-দই' হলেও 'কৈফিয়ত-তৈরি-বৈঠক'-এর ঐ-কার ঘুচল না কিছুতেই।

এমনি করে প্রথম ভাগের বানানে সরলীকরণ অবাধ হল বটে, তবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় ভাগের বানান-সরলীকরণের অনেকক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা যে মেনে নিতেই হল এখনকার বানান-ভাবুকদেরও—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা-বানানের নিয়ম' আর বাংলা আকাদেমির 'বানানবিধি' থেকে তা আন্দাজ করা যায়। বাংলা বানানের এই পাওয়া আর না-পাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই বিশ শতক সম্পূর্ণ হল।

১১৫.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. সরলীকৃত বানানের বাংলা শব্দকে কটি শ্রেণিতে কীভাবে ভাগ করা সম্ভব, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. 'সার্বিক সরলীকরণ' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন এবং এরকম প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ২টি করে শব্দ-বানান সংগ্রহ করে এদের সরলীকরণ-প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিন।

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রতিটি শ্রেণি (তৎসম অর্ধ-তৎসম...) থেকে দুটি করে শব্দ সংগ্রহ করে তাদের সরলীকরণ করুন এবং ঐ সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি বিকল্প শব্দ বানান হিসেবে প্রচলিত বানানও দেখিয়ে দিন।

৪. ২টি তৎসম এবং ২টি অ-তৎসম শব্দের উপর ঈ > ই আর ঊ > উ সূত্র দুটি প্রয়োগ করে প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সরলীকৃত ২টি করে বানান দেখিয়ে দিন এবং সেইসঙ্গে প্রতিটি সূত্রের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমের উল্লেখ করুন।

৫. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সার্বিক সরলীকরণ সম্ভব তা লিখুন এবং প্রতিটি সূত্রের প্রয়োগে ২টি করে উদাহরণ দেখিয়ে দিন।

৬. (ক) নীচের বানানগুলির মধ্যে কোন্‌টি সার্বিকভাবে সরলীকৃত, কোন্‌টির পাশে বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান রয়েছে, লিখুন (বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান থাকলে তা পাশাপাশি লিখে দেখান)—বইঠা কাহিনি খ্রিস্টান শ্রেণি ভর্তি দেশি রানি নিশ্বাস সূর্য মউ।

(খ) নীচের প্রচলিত বানানগুলির পাশে সরলীকৃত বানান লিখুন (সরলীকরণের সূত্র উল্লেখসহ) এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে পাশাপাশি বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান উল্লখ করুন—লাঙ্গল ঊষা ঈর্ষ্যা মারাঠী ঝিল্লী ঈদ পৈতা।

(গ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে ২টি করে সার্বিক সরলীকরণের উদাহরণ লিখুন—রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন, ঋ > রি, ণ > ন।

(ঘ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সরলীকৃত বানানের পাশে বিকল্প প্রচলিত বানান লিখুন—ঈ > ই, ঊ > উ, ঐ > অই, এ > অ্যা, ঙ > ং, অ > ও, য > জ।

(ঙ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সরলীকৃত বানানের পাশে ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান লিখুন—য > শ, য > জ, ঐ > অই, ঈ > ই (তৎসম), ঈ > ই (অ-তৎসম) ঔ > অউ, অ > ও।

১১৫.৬ সহায়ক পাঠ

একক-১১৫-এর বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা' (মে ১৯৮৬) বইটি থেকে প্রবোধচন্দ্র সেন, ভূদেব চৌধুরী আর ক্ষেত্র গুপ্তর লেখা প্রবন্ধ-তিনটি পড়ে নিন। সেইসঙ্গে পড়ুন পবিত্র সরকারের লেখা 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সমাধান' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আরও দুটি অংশ (পৃ. ৫৮-৬১, পৃ. ৬৬-৭৬)। এরপর মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান' বই-এর 'কতিপয় শব্দের বানান' অধ্যায়টি পড়ে নিতে পারেন (৩য় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০)।

উত্তর-সংকেত

[এই পর্যায়ের ৪টি এককে ছড়ানো মোট ১১টি অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নাবলির উত্তর-সংকেত পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য রাখবেন, এর মধ্যে কেবল সংকেতটুকুই দেওয়া থাকবে, পুরো প্রশ্নোত্তর অবশ্যই নয়। মূলপাঠের কোন্ অংশে আপনার তৈরি-করা মাঝারি আর বড়ো প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, পৃষ্ঠার উল্লেখ করে সরাসরি তার হদিস দেবে এই সংকেতগুলি। বিষয়মুখী বা ছোটো মাপের প্রশ্নের উত্তর অনেকটা অবশ্য সংকেত থেকেই পেয়ে যাবেন। সেই কারণে তার পাশে মূলপাঠের পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকবে না।]

১১২.৩.২ অনুশীলনী—১

১. (ক)

অ-ও ঃ	করিও-কোরিঅ	ই-ঈ ঃ	পুচ্ছি-চাপী
ঐ-অই ঃ	তৈলোএ-পইঠা	ঙ-ং ঃ	সাঙ্গ-লাংগ
ণ-ন ঃ	শূণ-শূন	শ-য-স ঃ	শবর-সবর-যবরালী

(খ) অ-ও ঃ জাঅ-জাঁও ই-ঈ ঃ দুই-দুঈ
উ-ঊ ঃ উঠ-ঊঠ ঔ-অউ ঃ চৌঠ-চউঠ
ণ-ন ঃ আগুণ-আগুন শ-স ঃ শুন-সুন।

(গ) ই-ঈ ঃ কাঁচালি-কাঁচলী উ-ঊ ঃ চুণ-চূণ
জ-য ঃ জোগাব-যোগব ক্ষ-খ ঃ ক্ষুদ-খুদ
হস্‌চিহ্ন ঃ সম্পদ্-সম্পদ।

(ঘ) ঐ-অই ঃ হৈল-হইল ঔ-অউ ঃ হৌক-বউ
হস্‌চিহ্ন ঃ কেন্-কোন বিসর্গ ঃ পুনঃ-পুন।

২. (ক) ক্ষ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ক্ষমা) ৎ ঃ চণ্ডীমঙ্গল (চিৎ)
ঞ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (অনিঞা) য ঃ চর্যাপদ (যোগী)
বিসর্গ (ঃ) চণ্ডীমঙ্গল (পুনঃ) রেফ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (গর্জ্জুন)
হস্‌চিহ্ন ঃ চণ্ডীমঙ্গল (বণিক্)।

(খ) চর্যাপদে 'কেহো', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কেহো-কেহ', চণ্ডীমঙ্গলে গোড়ার দিকে 'কেহো-কেহ' আর শেষের দিকে 'কেহ'।

(গ) ঐ-কার ঃ ঐ-কারের ঝোঁক থাকলেও পাশাপাশি 'অই' (উদাহরণ দিন)।

ঔ-কার ঃ ঔ-কার আর 'অউ'-এর পাশাপাশি প্রয়োগ (উদাহরণ দিন)।

(ঘ) চর্যাপদে 'শূণ', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'জাণ', চণ্ডীমঙ্গলে 'বেণ্যা', অন্নদামঙ্গলে 'বেণে'।

(ঙ) আলিবর্দ্দী, মুখুর্য্যা।

(চ) আণিঞা, পাঞাঁ, কানাঞি, গোসাঞি, ঠাঞি;
প্রয়োগ-সীমা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

৩. (ক) 'ক্ষণ'-র বদলে 'খন', 'ক্ষুর'-এর বদলে 'খুর', 'ক্ষেপ'-র বদলে 'খেপ'।

(খ) 'চিৎ' বানানটি 'চিত'-এর বিচ্যুতি।

(গ) 'অ-ও'-র ক্ষেত্রে ও-কারের ঝোঁক—মারিবোঁ আসিবোঁ আইলো,
'ই-ঈ'-র ক্ষেত্রে ঈ-কারের ঝোঁক—চীত, মতী, চুরী,
'ঐ-অই'-র ক্ষেত্রে ঐ-কারের ঝোঁক— ভৈল, পৈশে হৈলা।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঞ (কানাঞি), ক্ষ (ক্ষেমা), রেফ (গর্জ্জুন);
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ৎ (চিৎ), ঃ (পুনঃ), হস্‌চিহ্ন (সম্পদ্)।

(ঙ) হস্‌চিহ্ন ঃ '**কোন** সুখে যাইব ধরণী', 'কোথা **কোন্** যজ্ঞ হয়';
বিসর্গ (ঃ) ঃ **পুনঃ** কহ কি হইবে এখানে মরিলে,' '**পুন** হবে স্বর্গবাসী'।

৪. (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

(খ) 'জ'-উচ্চারণে 'য'।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

(ঘ) অন্নদামঙ্গল।

(ঙ) মুজঃফর, অন্নদামঙ্গল।

৫. ১১২.৩.১ সারাংশ-১ থেকে প্রতিটি কাব্যের বানান-প্রয়োগে বিভ্রান্তি বিচ্যুতি আর বিশেষ প্রবণতার ক্ষেত্রগুলি তালিকাবদ্ধ করুন। এরপর, ১১২.৩-এর মূলপাঠ থেকে ঐ ক্ষেত্রগুলি খুঁজে নিয়ে প্রশ্নোত্তরটি বিশদ এবং সম্পূর্ণ করুন।

১১২.৪.২ অনুশীলনী—২

১. (ক) ঙ-র দিকে (রঙ সঙ্গীত সঙ্কেত সঙ্কলিত)।

(খ) যত্নবান্-শ্রীমান।

(গ) ই-ঈ ঃ গিরি-গিরী, ণ-ন ঃ কেরাণী-কান
শ-ষ ঃ পুলিশ-পোষাক, হস্‌চিহ্ন ঃ কর্‌ছে-পড়বে।

(ঘ) চড়্কী সড়্সড়্ গর্‌রাও ফর্‌রা ঝম্‌ঝম্।

(ঙ) অ > ও ঃ গোরু ঈ > ই ঃ গাড়ি

ঋ > রি ঃ ব্রিটন এ > অ্য ঃ ল্যাজ।

২. (ক) উইলিয়ম কেরি, রামমোহন রায় থেকে তথ্য নিয়ে টীকা তৈরি করুন।

(খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায় থেকে তথ্য নিয়ে টীকা তৈরি করুন।

৩. সাময়িক পত্র থেকে তুলে আনা অংশগুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রগুলি সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৪. আলালি আর হুতোমি বানানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিন—ঐতিহ্য-অনুসারী ঐতিহ্য-বিরোধী আর দ্বিধাগ্রস্ত প্রয়োগ। যেমন, প্যারীচাঁদ মিত্রের পক্ষে ঐতিহ্য-অনুসারী একমাত্র বৈশিষ্ট্য রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ, দ্বিধার ক্ষেত্র শ-ষ প্রয়োগে (পুলিশ-পোষাক), বাকি প্রায় সবটাই ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতা। হুতোমি বানানে অ-তৎসম শব্দে 'ণ' প্রয়োগ ঐতিহ্য-অনুসারী বৈশিষ্ট্য, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ (চড়্কী-সড়সড়) ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতা, আবার ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগে রয়েছে দ্বিধা (এলো-গেল)।

১১২.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. মূলপাঠটি পড়ুন এবং প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. 'ই-ঈ' ঃ তৎসম পদ্যে দ্বিধা (কুটির-কুটীর)

তৎসম পদ্যে ঈ-কারের ঝোঁক (কাকলী-লহরী-নাড়ী-অন্তরীক্ষ)

তৎসম গদ্যে ই-কারের ঝোঁক (ঘটি-দায়ি)।

অ-তৎসম বানানে দ্বিধা (পূজারিনী-পূজারিনি)।

অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক (পাখি-আশি-বাঁশি-বাড়ি)।

'অ-ও' অ-তৎসম বানানে দ্বিধা (ভাল-ভালো মত-মতো কোন-কোনো)

অ-তৎসম বানানে ও-কারের ঝোঁক (তো-হয়তো-কারো-বারো-বড়ো)।

হস্‌চিহ্ন ঃ তৎসম বানানে দ্বিধা (মহান্‌-মহান বিপদ্‌গ্রস্ত-বিপদ)

হস্‌-বর্জনের ঝোঁক (দিক)।

এবার মূলপাঠ পড়ে ক্ষেত্র-তিনটি নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।

৩. 'বিসর্গ প্রয়োগ' আর 'হস্‌চিহ্ন প্রয়োগ'-এর উদাহরণগুলির সাহায্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৪. ঙ-ং আর বিসর্গ প্রয়োগে দ্বিধা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৫. তৎসম বানান-প্রসঙ্গের অনুচ্ছেদ-১, অ-তৎসম বানান- প্রসঙ্গের অনুচ্ছেদ-১, 'ই-ঈ'-র দৃষ্টান্তগুলি এবং থেকে তৃতীয় অনুচ্ছেদ—এই অংশগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৩.৩.২ অনুশীলনী—১

১. ১১৩.৩.১ সারাংশ-১ থেকে সাহায্য নিন।

২. মূলপাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৩. মূলপাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অংশ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তরটি তৈরি করুন।

৪. মূলপাঠের ষষ্ঠ আর সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৩.৪.২ অনুশীলনী—২

১. ১১৩.৪.১ থেকে সংকেত-সূত্র নিয়ে সমগ্র মূলপাঠটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

২. মূলপাঠের ১-নং ২-নং ৫-নং ১১-নং অংশ কটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তরটি তৈরি করুন।

৩. মূলপাঠের ৭নং অংশে গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী, ৮নং অংশে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ৯নং অংশে রাজশেখর বসু, ১০নং অংশে দেবপ্রসাদ ঘোষ—এঁদের মধ্য থেকে যেকোনও একজন

বানান-ভাবুককে বেছে নিন, তাঁর বক্তব্য সূত্রবদ্ধ করুন, এবং সবশেষে আজকের ভাবনায় তাঁর বক্তব্য কতটা গ্রহণীয় আর কতটা বর্জনীয় তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৪. মূলপাঠের ২-নং আর ১২-নং অংশে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩-নং অংশে সুধীর মিত্র, ৫-নং অংশে রবীন্দ্রনাথ-রাধারানি দেবী-নরেন্দ্র দেব, ৭-নং অংশে গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী, ৮-নং অংশে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ১০-নং অংশে দেবপ্রসাদ ঘোষ—ধ্বনি-বর্ণের অসমতার প্রসঙ্গে এঁদের বক্তব্য তালিকাবদ্ধ করুন, তারপর প্রতিটি বক্তব্যকে বিশদ করে বুঝিয়ে দিন।

১১৩.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধান-এর 'পরিশিষ্ট-ক' থেকে 'বানানের নিয়ম' অংশটুকু পড়ুন। এর পাশে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর 'পরিশিষ্ট ১' থেকে 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি' অংশটুকু পড়ুন। এই দুটি অংশের তুলনা থেকে তথ্যসংগ্রহ করুন এবং তারপর প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৪.৩.২ অনুশীলনী—১

১. মূলপাঠ-১ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. মূলপাঠের শেষ অনুচ্ছেদ বাদে বাকি অংশ পড়ে প্রশ্নোত্তর লিখুন।

৩. (ক) ঋ ৯ ঌ ঃ প্রয়োগ নেই;

অন্তস্থ-ব ঃ উচ্চারণ নেই;

ক্ষ ঃ যুক্তবর্ণ (ক ষ), একক ব্যঞ্জন নয়।

(খ) ড় ঢ় য় ঃ শব্দের মাঝখানে বা শেষে থাকলে ড ঢ য-এর এইরকম উচ্চারণ হয়;

ৎ ঃ তৎসম শব্দে এর প্রয়োগ আছে;

ঁ ঃ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে গণ্য।

১১৪.৪.২ অনুশীলনী—২

১. মূলপাঠ-২-এর অংশ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৫.৩.২ অনুশীলনী—১

১. মূলপাঠ-১ এর অংশটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, লিখনপদ্ধতির সংস্কার। মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৩. বর্ণচিহ্ন-বিন্যাস, বর্ণরূপের ভেদ আর অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন—এই তিন ধরনের জটিলতা। এরপর মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৫.৪.২ অনুশীলনী—২

১. মূলপাঠ-২ এর অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর রচনা করুন। প্রতিটি শ্রেণি থেকে তিন থেকে পাঁচটি করে উদাহরণ নিয়ে সরলীকরণের সাফল্য আর ব্যর্থতা দেখিয়ে দিন।

২. মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

১১৫.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. মূলপাঠ-৩ দেখুন।

ভাগ-১ (অর্চনা কর্ম সূর্য),

ভাগ-২ (দেশি-দেশী ঋক্থ-রিক্থ যুঁই-জুঁই),

ভাগ-৩ (পদবি উষা অহংকার কোশ শরণি)।

২. 'সার্বিক সরলীকরণ'-এর তাৎপর্য সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার পুরোপুরি সাফল্য। একটি প্রচলিত শব্দ তার সবরকমের জটিলতা কাটিয়ে সরল বানানে নতুন পরিচয় পাবে, এবং সেই শব্দ যে

শ্রেণির অন্তর্গত, তার প্রতিটি শব্দ-বানানই একই প্রক্রিয়ায় সরলীকৃত হবে, একই শ্রেণিভুক্ত আর কোনও প্রচলিত বানান বিকল্প বা ব্যতিক্রম হিসেবে সরলীকরণের বাইরে পুরোনো জটিল চেহারা নিয়ে অপরিবর্তিত থেকে যাবে না—'সার্বিক সরলীকরণ' বলতে আমরা এই রকম সরলীকরণকেই বুঝব।

সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
রেফের নীচে ব্যঞ্জনের	আর্য্য	আর্য
দ্বিত্ব-বর্জন (তৎসম ও অ-তৎসম)	জর্দ্দা	জর্দা
ঋ > রি (অ-তৎসম)	খৃষ্টান	খ্রিস্টান
	বৃটিশ	ব্রিটিশ
ণ > ন (অ-তৎসম)	কাণ	কান
	দরুণ	দরুন

উপরের তিনটি সূত্র প্রয়োগ করে বাংলা বানান থেকে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, ঋ আর ণ-কে পুরোপুরি মুছে দিয়ে এই তিনটি শ্রেণির অন্তর্গত প্রতিটি বানানকেই সরলীকৃত করা সম্ভব হল। রইল না কোনও বিকল্প বা ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান।

৩. তৎসম ঃ দেশি-দেশী, ঋক্থ-রিক্থ

অর্ধ-তৎসম ঃ উনতিরিশ-ঊনত্রিশ, ভটচাজ্জি-ভটচায্যি

তদ্ভব ঃ বইঠা-বৈঠা, জুঁই-যুঁই

দেশি ঃ কাহিনি-কাহিনী, সড়াৎ-সড়াত

বিদেশি ঃ ইদ-ঈদ, ব্যাংক-ব্যাঙ্ক

৪.

শ্রেণি	সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান	ব্যতিক্রম
তৎসম	ঈ > ই	পদবী	পদবি	মাধবী
		ভঙ্গী	ভঙ্গি	সঙ্গী
	ঊ > উ	ঊষা	উষা	ঊর্মি
		ঊর্ণা	উর্ণা	ঊরু

অ-তৎসম	ঈ > ই	সরকারী	সরকারি	
		পাকিস্তানী	পাকিস্তানি	কানাডীয়
	ঊ > উ	ঊনিশ	উনিশ	ঊনত্রিশ
		পূজা	পুজো	পূজারি

৫. সার্বিক সরলীকরণের ক্ষেত্র—রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন (তৎসম-অতৎসম), ঋ > রি (অ-তৎসম), ণ > ন (অ-তৎসম)।

উদাহরণের জন্য উপরের ২নং উত্তর-সংকেত দেখুন।

৬. (ক) সার্বিকভাবে সরলীকৃত— খ্রিস্টান (অ-তৎসম বানানে ঋ > রি), সূর্য ভর্তি (রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন), রানি (অ-তৎসম বানানে ণ > ন)।

পাশাপাশি বিকল্প বানান—বইঠা-বৈঠা, কাহিনি-কাহিনী, দেশি-দেশী।

পাশাপাশি ব্যতিক্রমী বানান—শ্রেণি-ফণী, নিশ্বাস-অতঃপর, মউ-মৌলানা।

(খ)

প্রচলিত বানান	**সরলীকৃত বানান**	**বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান**	**সূত্র**
লাঙ্গল	লাঙল	জঙ্গল (ব্যতিক্রম)	ঙ্গ > ঙ
ঊষা	উষা	ঊর্মি (ব্যতিক্রম)	ঊ > উ
ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা	x	য-ফলা বর্জন
মারাঠী	মারাঠি	কানাডীয় (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
ঝিল্লী	ঝিল্লি	হরিণী (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
ঈদ	ইদ	ঈশ্বর (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
পৈতা	পইতা	পৈতা (বিকল্প) বৈঠক (ব্যতিক্রম)	ঐ > অই

(গ) উপরের ২-নং উত্তর-সংকেত দেখুন।

(ঘ) ঈ ই ঃ দেশি-দেশী ঙ > ং ঃ ব্যাংক-ব্যাঙ্ক

ঊ > উ ঃ উনতিরিশ-ঊনত্রিশঅ > ও ঃ সড়োগড়ো-সড়গড়

ঐ > অই ঃ বইঠা-বৈঠা য-জ ঃ জুঁই-যুঁই

এ > অ্যা ঃ খ্যাসারত-খেসারত

(ঙ) য > শ ঃ কোষ > কোশ, দোষ ঈ > ই (অ-তৎসম) ঃ অসমীয়া > অসয়িা, অস্ট্রেলীয়

য > জ ঃ যো > জো, যত ঔ > অউ ঃ মৌজ > মউজ, মৌজা

ঐ > অই ঃ কৈ > কই, কৈফিয়ত অ > ও ঃ মত > মতো, কত

ঈ > ই (তৎসম) ঃ পদাবলী > পদাবলি, শ্যামলী